॥ শ্রীহরিঃ॥ 1920

# আহার নিরামিষ না আমিষ ?
# সিদ্ধান্ত নিজেই নিন

( शाकाहार या मांसाहार— फैसला आपका )

( बँगला )

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

1920

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# আহার নিরামিষ না আমিষ ? সিদ্ধান্ত নিজেই নিন

( शाकाहार या मांसाहार—फैसला आपका )

( बँगला )

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# নিবেদন

বর্তমান যুগে মানুষের স্বাস্থ্য-সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তথা বৈদ্যুতিন (Electronic) সংবাদ-মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত নিয়মিত আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শ ইত্যাদি বিষয়গুলির গুরুত্ব সহকারে প্রচার থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। দেশের তরুণ প্রজন্ম স্বাস্থ্য সম্পর্কে উৎসাহী— এটি জাতির পক্ষে সুলক্ষণ। স্বাস্থ্যের সুরক্ষার সঙ্গে খাদ্য-গ্রহণের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়ার ফলে সকলের মধ্যেই এ বিষয়েও বিশেষ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে। কী ধরণের খাদ্য আমাদের শরীরের পক্ষে অনুকূল এবং পরিণামে হিতকর তা জানা থাকলে বহুবিধ রোগ-ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই আমিষ এবং নিরামিষ আহারের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়, কারণ বহু মানুষেরই এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নেই। অধিকাংশ সভ্য দেশেই প্রাচীন কাল থেকে মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নিরামিষ আহারের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করে এসেছেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই রকমই কিছু বক্তব্যের সংকলন করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে গোরক্ষপুরের গীতা প্রেস দ্বারা প্রকাশিত **'কল্যাণ'** পত্রিকায় মহাত্মা জয়দয়াল গোয়েন্দকা হিন্দী ভাষায় এই বিষয়ে কিছু তথ্যপূর্ণ মূল্যবাণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এছাড়াও দিল্লীর 'জৈন বুক এজেন্সী' প্রকাশনা সংস্থা থেকে বহুকাল পূর্বে **'शाकाहार या मांसाहार—फैसला आप स्वयं करें'** নামে হিন্দীতে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল যা এবিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করে। এই লেখাগুলির কোনোটিই এখন সহজলভ্য নয় বলে জিজ্ঞাসুদের সুবিধার্থে সেই মূল হিন্দী রচনাগুলি বাংলায় অনুবাদ করে নতুনভাবে সাজিয়ে দেওয়া হল। যত্নের সঙ্গে এই অনুবাদের কাজটি করেছেন গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটির নামকরণেই স্পষ্ট-সিদ্ধান্তের দায়িত্ব পাঠকগণের নিজস্ব,—প্রকাশকের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র কিছু যুক্তি ও তথ্য একসঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এর বেশি কোনো বক্তব্য আমাদের নেই।

—**প্রকাশক**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

## বিষয়-সূচী



———০———

# (১) নিরামিষ বনাম আমিষ আহার

যদিও জগতে বহু লোক আমিষ আহার করেন, কিন্তু চিন্তা করলে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে আমিষ আহার সর্বতোভাবে ক্ষতিকর। এর দ্বারা ইহলোক-পরলোক দুই-ই নষ্ট হয়। বহু লোক এমন আছেন, যাঁরা আমিষ খাদ্য ক্ষতিকারক জেনেও কু-অভ্যাসের বশবর্তী হওয়ায় এটি ত্যাগ করতে পারেন না। কিছু লোক আবার আরাম ও ভোগাসক্তির বশীভূত হয়ে আমিষ খাওয়া সমর্থন করেন । কিন্তু আমিষ খাদ্য থেকে উৎপন্ন হওয়া দোষের কোনো সীমা নেই। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ আদি বিশ্বের সমস্ত বিশিষ্ট ধর্মের প্রচারক এবং মহাপুরুষগণ হিংসা, ক্রূরতা, অসত্য, ক্রোধ, দ্বেষ এবং অন্য জীবদের অকারণ কষ্ট বা পীড়া দেওয়াকে অপরাধ বলেছেন এবং অহিংসা, দয়া, ক্ষমা, সত্য, করুণা ইত্যাদিকে ধর্ম বলে জানিয়েছেন। তাঁদের প্রধান শিক্ষা হল প্রাণীমাত্রেই সেই পরম পিতারই প্রকাশ দেখে সকলের সঙ্গে সুব্যবহার করা। এই সকল মহাপুরুষগণ শুধুমাত্র আমিষ আহারের নিন্দাই করেননি, তাঁরা সমস্ত জীব-জন্তু, পশু-পক্ষীদের প্রতি দয়া এবং করুণাপূর্ণ ব্যবহারের শিক্ষাপ্রদান করেছেন এবং খাদ্য ইত্যাদি দ্বারা তাদের জীবন-রক্ষা করাকে শুভকর্ম বলেছেন।

প্রকৃতি যেখানে মানুষের আহারের জন্য নানাবিধ বনস্পতি এবং স্বাদু-পদার্থ উৎপন্ন করেছে, সেই প্রকৃতিই আবার মানুষের সেবা ও সহায়তার জন্য বিভিন্ন পশু-পক্ষীর সৃষ্টি করেছে। এই পশু-পক্ষী একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ভারসম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে অন্যদিকে মানুষের সামান্য দয়া ও ভালোবাসা পেয়ে তারা মানুষের থেকেও বেশি প্রভু ভক্ত ও বিশ্বাসভাজন হয়ে জীবন দিয়ে তাদের সেবা করে।

সেই মানব, প্রকৃতি যাদের শরীরের গঠন মাংসাহারী প্রাণীদের মতো না করে নিরামিষাশী প্রাণীদের মতো করেছেন, তারা যদি প্রকৃতি, ধর্ম ও মহাপুরুষদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমিষ ভক্ষণ করে, তাহলে সেটি হবে তাদের পক্ষে অত্যন্ত কৃতঘ্নতা ও দুষ্কর্ম। জগতের সমস্ত জীব-জন্তু আমাদেরই

মতো পরম পিতার সন্তান। সেই পরম পিতা কি তাঁর এক সন্তানের দ্বারা অন্য সন্তানের অকারণ হত্যা সহ্য করবেন ? না, কখনই নয়। কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। **শুভ বা অশুভ কোনো কর্ম কখনই বৃথা যায় না, তার পুরস্কার বা শাস্তি আগে বা পরে অবশ্যই পেতে হয়।** এ অতি নিশ্চিত ও অটল সত্য।

আমিষ আহারের কুফল সুবিদিত। এখন বিশ্বের সকল দিক্ থেকে বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তারেরা সতর্ক করছেন যে, আমিষ আহার ক্যান্সার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আয়ু ক্ষীণ করে এবং নিরামিষ আহার অত্যন্ত পুষ্টিদায়ক এবং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে ; তা সত্ত্বেও মানুষ যদি অন্ধের মতো আধুনিকতার নকল করতে গিয়ে আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে, তবে সেটি তার দুর্ভাগ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পশুকে হত্যা করার আগে তার শরীরের রোগ সম্বন্ধে কোনো পরীক্ষা করা হয় না, তাই তার শরীরের সম্ভাব্য রোগ আমিষ খাদ্য ভক্ষণকারী ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। ভয়াবহ পরিবেশে অন্যান্য পশুদের সামনেই ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে প্রতিটি পশুকে হত্যা করা হয়। তার ফলে দুঃশ্চিন্তা (টেনশন), ভয়, ক্রোধ, আতঙ্কে পশুর রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং দেহে এ্যাডরিন্যালিন (Adrenalin) নামক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাতে তার মাংস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। সেই বিষাক্ত, রোগগ্রস্ত মাংস আমিষ আহারীর শরীরে প্রবেশ করে তাকে নানা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত করে আর সেই পশুটির মৃত্যুর মুহূর্তে করা শপথ যে 'তুমি যেমন আমাকে খাবে, আমিও তোমায় তেমনভাবে খাব', পূর্ণ করে।

আমিষাশী বন্ধুগণ ! দয়া করে পরের বার আমিষ খাদ্য গ্রহণের পূর্বে একবার মুরগী পালন কক্ষে গিয়ে এই মূক প্রাণীদের ওপর কীভাবে অত্যাচার করে তাদের বধ করা হয়, সেই অত্যাচার—তাদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের হত্যা করার পদ্ধতি দেখে, খাবার সময় সেগুলি চিন্তা করবেন এবং নিজেদের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবত্বের কী এই পরিচয় যে, আমরা শুধু নিজেদের রসনার স্বাদের জন্য এইসব নিরপরাধ প্রাণীদের জীবন চিরকালের জন্য ছিনিয়ে নিই, যা আমরা কখনোই তাদের

ফিরিয়ে দিতে পারি না ?

প্রিয় বন্ধুগণ ! কৃপা করে নিজেদের লাভ ও ক্ষতির বিষয় চিন্তা করুন। আমিষ খাদ্য পুষ্টির পরিবর্তে শরীরে অসাধ্য রোগের সংক্রমণ করে আয়ু হ্রাস করে ; মন, বুদ্ধি ইত্যাদি দূষিত করে সুখ-শান্তি নষ্ট করে এবং আমাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটায়। এটি শুধু আমাদের অনাগত বংশকে অসাধ্য রোগাক্রান্ত করে তাই নয়, এটি আমাদের অপার দুঃখ-কষ্টেও ফেলে দেয়। নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে মাংসাহার জনিত অসুখ, হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং অন্য সামাজিক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য আজই আমিষ খাদ্য পরিত্যাগ করুন। ভুল শোধরানোর জন্য যে কোনো মুহূর্তই উত্তম। শাস্ত্র অনুসারে 'আমিষ খাদ্য পরিত্যাগকারীর যজ্ঞকারীর মতো ফল লাভ হয়'।

———o———
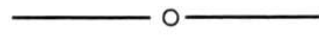
## (২) মানুষের আহার কেমন হবে

মানুষের জীবিত থাকার জন্য বায়ু এবং জলের পর সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু হল আহার। মানুষের আহার্য কেমন হবে, তার উদ্দেশ্য কী, সেটি কী এবং তা কতোটা হবে, তার দিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন।

**মানুষের আহারের উদ্দেশ্য**—ভোজনে মানুষের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র উদর-পূর্তি, স্বাস্থ্য রক্ষা বা স্বাদ নয় ; বরং মানসিক এবং চারিত্রিক বিকাশও তার লক্ষ্য। আমাদের আচার, বিচার, ব্যবহার সবকিছুর সঙ্গেই আহারের গভীর সম্পর্ক আছে। প্রসিদ্ধ উক্তি আছে যে '**যেমন খাদ্য খাবে, তেমনি মন তৈরি হবে**'—আজ একথা সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ যেসব পশু-পক্ষীর মাংস আহার করে, সেই পশু-পক্ষীর গুণ, আচরণ ইত্যাদি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ফলে তার প্রকৃতিও ক্রমশঃ সেইরূপ হতে থাকে। সেইজন্য সেই ব্যক্তি ইহজন্মেই মনুষ্যোচিত স্বভাব থেকে প্রায়শঃ চ্যুত হয়ে পশুস্বভাবসম্পন্ন, ক্রূর ও অমর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে থাকে এবং মৃত্যুর পর সেই ধারণার ফলস্বরূপ, আর নিজ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য সেই পশু-জন্ম প্রাপ্ত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করে। পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন—

**যেন যেন শরীরেণ যদ্যৎ কর্ম করোতি যঃ।**
**তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে॥**

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১১৬।২৭)

'যে যে শরীরে প্রাণী যেমন যেমন কর্ম করে, সেই সেই শরীর লাভ করে সে তেমন তেমনই ফল ভোগ করে।'

মানুষের বিভিন্ন প্রকারের আহারের প্রতি রুচি তার আচরণ ও চরিত্র প্রকাশ করে। তাই আমাদের আহারের উদ্দেশ্য হবে সেই সব পদার্থ গ্রহণ যা আমাদের শারীরিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী এবং স্নেহ, প্রেম, দয়া, অহিংসা, শান্তি ইত্যাদি গুণের বৃদ্ধিকারী হয়।

**মানুষের আহার কেমন হবে**— আহার এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যাতে শরীরে শক্তি, পুষ্টি এবং উত্তাপ বজায় থাকে ; প্রোটিন, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ জাতীয় পদার্থ অনুপান ও পর্যাপ্ত মাত্রায় থাকা প্রয়োজন যাতে শরীরে ভালো ভাবে নতুন কোষ (New Cells) এবং R.B.Cs. তৈরি হয়, কারণ আমাদের শরীরে লক্ষ লক্ষ R.B.C. (Red Blood Corpuscle) প্রতি সেকেণ্ডে ধ্বংস হয় ও উৎপন্ন হয়। এরূপ অনুমান করা হয় যে ছয় বছরে আমাদের শরীরের সকল কোষাণু (Cells and Tissues)[১] সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় অর্থাৎ সাপ যেমন প্রত্যেক ছয় মাসে তাদের চামড়া (Skin) পরিবর্তন করে, তেমনই ছয় বছরে আমাদের শরীরের সমস্ত কোষাণু (Cell and Tissues) সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়, যার গুণাগুণ আমাদের খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে আহার্যে এমন পদার্থ থাকা উচিত যাতে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা এবং শরীরের ময়লা এবং ক্ষতিকারক জিনিষ (toxins) বার করার পথে বাধা না হয়। খাদ্যে রোগ উৎপাদক, স্বাস্থ্যনাশক এবং উত্তেজনাকারী বস্তু যেন না থাকে, কারণ তাতে মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে আবেগের জন্ম দেয় আর মানুষকে অমর্যাদাসম্পন্ন ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে।

**মানুষের খাদ্য কী হবে**— প্রকৃতি মানুষের আহারের জন্য নানাপদার্থ আনাজ, ফল, শাক-সব্জী ইত্যাদি উৎপন্ন করেছে, যাতে সর্বপ্রকার পুষ্টিদায়ক বস্তু পর্যাপ্ত মাত্রায় বিদ্যমান। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা এইরূপ হবে—

[১] Ahinsa Voice, 90 Sharma Sahitya Sansthan, Delhi.

| | প্রোটিন (গ্রাম) | ফ্যাট (গ্রাম) | ক্যালোরী |
|---|---|---|---|
| পুরুষ (Moderate work) | 60 | 15 | 2700 |
| পুরুষ (Sedentary work) | 60 | 15 | 2350 |
| মহিলা (Moderate work) | 50 | 15 | 2100 |
| মহিলা (Sedentary work) | 50 | 15 | 1800 |
| ছেলে (১৩-১৫ বছর) | 71 | 15 | 2400 |
| মেয়ে (১৩-১৫ বছর) | 67 | 15 | 2050 |

এই প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত শাকাহারী খাদ্য দ্বারা ভালোভাবে পূর্ণ করা সক্ষম—

| [১]পদার্থ | মাত্রা(গ্রাম) | প্রোটিন | ফ্যাট | ক্যালোরী |
|---|---|---|---|---|
| আনাজ (Cereals) | 400 | 48.4 | 6.8 | 1384 |
| ডাল (Pulses) | 60 | 14.6 | 7.3 | 209 |
| সবুজ পত্রবিশিষ্ট সব্জী (Leafy-Green-Vegetables) | 100 | 2 | 0.7 | 26 |
| অন্যান্য সব্জী | 75 | 2 | 0.3 | 22 |
| মূল ইত্যাদি (Roots & Tubers) | 75 | 1.2 | — | 72 |
| আলু, গাজর ইত্যাদি | | | | |
| ফল | 50 | 0.3 | — | 24 |
| দুধ | 250 | 8.0 | 10.2 | 168 |
| তেল, ঘি ইত্যাদি (Fats) | 25 | — | 25 | 225 |
| শর্করা (Sugar) | 30 | — | — | 120 |
| মোট (Total) | | 76.5 | 50.3 | 2250 |

নিজের রুচি অনুসারে ১৯পাতায় বর্ণিত তালিকা থেকে নিজের পছন্দ

[১] Nutritive Value of Indian Foods, issued by National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad.

মতো জিনিষ বেছে নেওয়া যেতে পারে এবং আর্থিক ক্ষমতানুসারে সস্তা বা দামী পৌষ্টিক শাকাহারী আহার্য তৈরি করা যেতে পারে। শাকাহারী খাদ্য যে শুধু সস্তা তাই নয়, এটি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রদান করে আমাদের স্বাস্থ্য, সময় এবং অর্থেরও সাশ্রয় করে। রান্না না করা ফল এবং সব্জীর দ্বারা বহু অসুখ ঠিক হয়। কয়েক প্রকারের Dietery Fibre  তো গাছ থেকেই পাওয়া যায়। এইসব fibre ব্লাড কোলেষ্টরল কম রাখে এবং ডায়াবিটিজ ইত্যাদি অসুখ থেকে রক্ষা করে।

**কতটা আহার করবেন**—যতো ব্যক্তি অনাহারে মরে, তার থেকে বেশি লোকের মৃত্যু হয় অত্যধিক আহারে। বেশি খাওয়ার থেকে কম খাওয়া ভালো। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা '**বাঁচার জন্য খাই, খাওয়ার জন্য বাঁচি না**।' সুতরাং ক্ষুধা অনুসারে আমাদের একটু কম খাওয়াই উচিত, কারণ অন্য কাজের মতো খাওয়াও এক অভ্যাস। একই ধরনের কাজে নিযুক্ত, সমবয়স্ক সব ব্যক্তির আহার এক প্রকার হয় না। কেউ বেশি খায়, কেউ আবার তার থেকে কম খায়। কম খাওয়া ব্যক্তির স্বাস্থ্য বেশি খাওয়া ব্যক্তির থেকে কম শক্তিশালী হয় না। পুষ্টিদায়ক খাদ্যভক্ষণকারী প্রায়শঃ মোটা হয়ে যায় এবং তাতে জড়তা ও আলস্য উৎপন্ন হয় এবং বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য আদি পেটের রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। অধিকাংশ রোগেরই প্রধান কারণ হল অত্যধিক আহার।

ইংরাজীতে এক উক্তি আছে Bigger the waist-line shorter is life line অর্থাৎ যত বেশি মোটা হবে, আয়ু তত কম হবে। মহান সূফী শেখ সাদীর মতানুসারে পেটকে চারভাগ মনে করে তার দুভাগ খাবার ও একভাগ জল দিয়ে ভর্তি করে  যে এক ভাগ খালি রাখে তার প্রতি ঈশ্বর সৌভাগ্য বর্ষণ করেন। স্বাদের বশীভূত হয়ে ক্ষুধায় অধিক খেলে দৈহিক সমস্যাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শাস্ত্রে বিদ্যার্থী এবং সাধকদের স্বল্পাহারী হওয়া আবশ্যক বলে জানানো হয়েছে।

নিরামিষ আহারের আর একটি বড়ো লাভ হল এই যে, এর দ্বারা অতি সহজেই পেট ভরে যায়। তাই শরীরের প্রয়োজনের থেকে বেশি খাওয়া কঠিন হয়, ফলে এতে মোটা হওয়ার সমস্যা কমে যায়।

আমাদের শরীর এক অদ্ভুত বিশাল যন্ত্র, যার দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, রক্ত তৈরি হওয়া, রক্ত পরিষ্কার করা, খাদ্য হজম করা এবং অনাবশ্যক বস্তু বাইরে বের করা ইত্যাদি নানাক্রিয়া নিরন্তর হতে থাকে। অন্য যন্ত্রের মতো আমাদের এই দেহ-যন্ত্রকেও সুচারুরূপে কাজ করাবার জন্য কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, যেটি সপ্তাহে একদিন উপবাসের মাধ্যমে সম্ভব। তাতে আমাদের পাচন যন্ত্র ইত্যাদির উপর চাপ কিছুটা কমে যায় এবং তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন রোগের থেকে রক্ষা হয়। শরীর সুস্থ রাখার জন্য অধিক খাদ্যের প্রয়োজন নেই, একে যতো সীমিত পর্যাপ্ত খাদ্য দেওয়া যায়, এটি ততোই অধিক কাজ করে। অধিক খাদ্য দিলে, তা কম কাজ করে। 'খাদ্য আমাদের জন্য, আমরা খাদ্যের জন্য নয়' সুতরাং স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য কম-খাবার গ্রহণের সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত।

**দেহের ক্ষুধা এবং মনের ক্ষুধার মধ্যে পার্থক্য**— মানুষ নিজের সব কর্মকে সমর্থন করার জন্য প্রায়শঃ বলে থাকে যে 'পেটের জন্যই সব করতে হয়।' এই কথা ঠিকই যে ক্ষুধার জন্যই সব প্রাণী ব্যাকুল হয়ে পথভ্রষ্ট হয় কিন্তু তার চেয়েও বেশি সত্য হল যে, জঠরের ক্ষুধা সীমিত হয় এবং তা অল্প পরিশ্রমে তথা অন্যায়-পথ অবলম্বন ছাড়াই পূরণ সম্ভব হয়। মানুষের যে ক্ষুধা কখনও পূর্ণ হয় না, এবং যা পূর্ণ করার জন্য মানুষ অন্যায় করে, সেটি তার পেটের ক্ষুধা নয়, তা তার মনের ক্ষুধা ; তাকে যতো তৃপ্ত করার চেষ্টা করা হয়, সেটি ততো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা পূর্ণ করার জন্য মানুষ ছল, কপটতা, অন্যায় অপরাধ এমন কি হত্যা পর্যন্ত করে বসে, যার পরিণামে ভয়, অশান্তি, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি ঘিরে ধরে এবং মানুষকে নানাপ্রকার মাদকবস্তুতে আসক্ত ও রোগগ্রস্থ করে।

একথা প্রায়ই বলা হয় যে **'পেট তো ভরেছে, কিন্তু মন ভরেনি'**। এই মন না ভরা থেকেই নানা সমস্যার উৎপত্তি হয়। এই শরীরের ক্ষুধা এবং মনের ক্ষুধার পার্থক্য উপলব্ধিতেই মানুষের কল্যাণ নির্ভর করে।

———○———

## (৩) প্রকৃতি মানব-শরীর নিরামিষাশী জীবদের মতোই সৃষ্টি করেছেন

এই জগতে নিরামিষ ও আমিষ-আহারী জীবদের বহু জাতি এবং অনেক প্রকার ছোট থেকে বড়ো আকারের বিভিন্ন প্রকারের জীব আছে, কিন্তু নিরামিষ খাদ্য গ্রহণকারী জীবদের শরীরের গঠন, হাত, পা, দাঁত ইত্যাদি এবং তাদের দেখার, ঘ্রাণ নেবার শক্তি এবং খাওয়া-দাওয়ার ভঙ্গী মাংসাহারী জীবদের থেকে পৃথক হয়। যেমন—

১) মাংসাহারী জীবদের নখ ও দাঁত শাণিত হয় যাতে তারা শিকার ধরে কেটে ছিঁড়ে খেতে পারে।

নিরামিষাশী জীবদের দাঁত তত শাণিত হয় না, হাতের থাবার নখও তত তীক্ষ্ণ হয় না যাতে শিকারকে কাটা-ছেঁড়া করা যায়। তাদের দাঁত ও নখ ফল ইত্যাদি খাবার উপযুক্ত হয়ে থাকে।

২) নিরামিষাশী জীবদের নীচের চোয়াল শুধুমাত্র ওপরে-নীচে নড়াচড়া করে এবং তারা খাবার না চিবিয়েই গিলে ফেলে।

নিরামিষাশী জীবদের নীচের চোয়াল ওপর, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে—সব দিকেই নড়াচড়া করে এবং তারা খাবার চিবিয়ে খায়।

৩) মাংসাহারী জীবদের জিভ ধারালো (কর্কশ) হয়, তারা জিভ বার করে তার দ্বারা জল পান করে।

নিরামিষাশীদের জিভ নরম হয়, তারা জলপান করার জন্য জিভ বার করে না, বরং ঠোঁট দিয়ে জল পান করে।

৪) মাংসাহারী জীবদের অন্ত্র (Intestine) কম লম্বা হয়, সেটি প্রায়শঃ তাদের দেহের দীর্ঘতার সমান লম্বা হয় এবং কোমর থেকে গলা পর্যন্ত দেহাংশের ৬ গুণ লম্বা হয়। অন্ত্র ছোট হওয়ায় মাংস পচন ধরা বা বিষাক্ত হওয়ার আগেই তা শরীর থেকে বার হয়ে যায়।

নিরামিষাশী জীবদের অন্ত্র (Intestine) অধিক লম্বা হয়, সেটি তাদের দেহের দীর্ঘতার চার গুণ ও মূল দেহের থেকে ১২ গুণ বেশি লম্বা হয়, তাই

সেটি মাংসকে শীঘ্র বাইরে ফেলতে পারে না।

৫) মাংসাহারী জীবদের লিভার ও কিডনী অনুপাতে বড় হয়, যাতে মাংসের অপ্রয়োজনীয় অংশ সহজে দেহ থেকে বার হতে পারে।

নিরামিষাশীদের লিভার ও কিডনী ছোট হয়, তা মাংসের অপ্রয়োজনীয় অংশ বাহিরে বের করতে পারে না।

৬) মাংসাহারী জীবদের পাচক যন্ত্রে মানুষের পাচক যন্ত্র থেকে দশগুণ বেশি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয়, যাতে মাংস সহজে হজম হয়।

নিরামিষাশী জীবদের পাচক যন্ত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কম তৈরি হয়, তাই মাংস তেমন সহজে হজম হয় না।

৭) মাংসাহারী জীবদের স্যালিভা (মুখের লালা) অ্যাসিডিক (Acidic) হয়।

নিরামিষাশীদের মুখের লালা (Saliva) এ্যালকাইন (Alkaline) হয় এবং তাদের লালায় টায়লিন (Ptyaline) থাকায় কার্বোহাইড্রেট্স হজমে সুবিধা হয়।

৮) মাংসাহারী জীবদের রক্তে PH কম থাকে ফলে তাতে Acidic tendency থাকে।

নিরামিষাশীদের রক্তে PH বেশি হয় ফলে সেটির tendency Alkaline মুখি হয়।

৯) মাংসাহারী জীবদের Blood Lipo-Proteins ভিন্ন প্রকারের হয়।

নিরামিষাশী মানুষ ও পশুদের ব্লাড লিপো প্রোটিন একই ধরনের হয় এবং মাংসাহারী জীবদের থেকে তা ভিন্ন প্রকারের হয়।

১০) মাংসাহারী জীবদের ঘ্রাণশক্তি তীব্র হয়, রাত্রে তাদের চোখ জ্বলজ্বল করে এবং দিনের মতোই দেখতে পায়। এই শক্তি তাদের শিকার করায় সাহায্য করে।

নিরামিষাশী জীবদের ঘ্রাণশক্তি তত তীব্র নয় এবং রাত্রে দিনের মতো দেখার শক্তি থাকে না।

১১) মাংসাহারী জীবদের আওয়াজ কর্কশ ও ভয়ংকর হয়।

নিরামিষাশী জীবদের আওয়াজ কর্কশ হয় না।

১২) মাংসাহারী জীবদের বাচ্চারা জন্মের পর প্রায় এক সপ্তাহ দেখতে পায় না।

নিরামিষাশী জীবদের বাচ্চারা জন্মের সময় থেকেই দেখতে পায়।

উপরোক্ত তথ্যাদি দ্বারা জানা যায় যে, প্রকৃতি মানুষের সৃষ্টি করেছে অন্যান্য শাকাহারী জীব তথা গরু, ঘোড়া, উট, জিরাফ, বলদ ইত্যাদি শাকাহারী জীবেদের মতো, তাদের নিরামিষ খাদ্য সহজে প্রাপ্ত করার ও হজম করার ক্ষমতা দিয়েছে। মানুষ ব্যতীত জগতের কোনো জীব প্রকৃতি প্রদত্ত শরীর ও স্বভাবের বিপরীত আচরণ করতে চায় না। বাঘ-সিংহ ক্ষুধার্ত হলেও শাকাহারী হয় না এবং গরুর ক্ষুধা পেলেও সে মাংসাহারী হয় না, কারণ এসব তাদের স্বাভাবিক বা প্রকৃতি অনুকূল খাদ্য নয়। মাংসাহারী পশু সারাজীবন মাংসাহার করে, কারণ এই তার খাদ্য। কিন্তু মানুষ শুধু মাংসাহার করে বেশিদিন জীবিত থাকতে পারে না কারণ শুধু মাংস খেলে তার শরীরে এতো বেশি অ্যাসিড এবং টক্সিন উৎপন্ন হবে যে তার ফলে তার শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া বিকল হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে মাংসাহার করে, তার কিছু না কিছু নিরামিষ আহার করতেই হয়, কারণ শুধুমাত্র মাংসাহার অপূর্ণ খাদ্য এবং তাতে মানুষের আয়ুক্ষীণ হয়। এস্কিমোরা (Eskimos) যে পরিস্থিতিতে প্রায়শঃ মাংসাহার করে থাকে, তাদের গড় আয়ু মাত্র ত্রিশ বৎসর হয়। কিন্তু নিরামিষ খাদ্য গ্রহণকারী মানুষ সুস্থভাবে দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে।

[১]জন্স্ হোপকিন্স ইউনিভার্সিটির ডাঃ এলন ওয়াকার দাঁতের Mycroscopic Analysis করে বলেছেন যে, মানুষ নিরামিষাশীদের বংশধর, মাংসাহারীদের নয়।

কোনো ব্যক্তিই ফল, সব্জী, আনাজ দেখে মুখ ফেরায় না, কিন্তু অনেকেই ঝোলানো মাংস দেখে ঘৃণা করে। এটা কি মানুষের স্বাভাবিক শাকাহারী প্রকৃতির দ্যোতক নয় ?

উপরোক্ত সকল তথ্যই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতি মানুষকে নিরামিষাশী এবং নিরামিষ খাদ্যেরই অনুকূল করে সৃষ্টি করেছেন।

———o———

[১]Jane Brody's Nutrition Book, Nov. 81, published by W. W. Norton & Co. Inc, 5th Avenue, New York.

## (৪) নিরামিষ খাদ্য বেশি পুষ্টিকারক ও গুণসম্পন্ন

আধুনিকতাবশতঃ নিজ সংস্কৃতি, আচার-বিচার, ব্যবহার সব কিছুকে জলাঞ্জলি দেওয়া ব্যক্তিদের মিথ্যাধারণা হল যে শাকাহারে উচিত মাত্রায় প্রোটিন বা শক্তিবর্ধক পুষ্টি প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু এটি ঠিক নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় জানা যায় যে, নিরামিষ খাদ্যে শুধু যে উচ্চশ্রেণীর প্রোটিন প্রাপ্ত হয় তাই নয়, এমনকি অন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, ক্যালোরী ইত্যাদিও বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়। সোয়াবীন, চিনাবাদাম ইত্যাদিতে মাংস বা ডিমের থেকে বেশি প্রোটিন থাকে। সাধারণ ডালেও প্রোটিনের মাত্রা কম থাকে না। গম, চাল, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে ডাল এবং সবুজ সবজী আহার করলে শুধু যে প্রোটিনের প্রয়োজন পূর্ণ হয় তাই নয়, এর দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যালান্স খাদ্য প্রাপ্তি হয়, যা নিরামিষাশী ব্যক্তিকে আমিষাশী থেকে বেশি সুস্থ, নীরোগ এবং দীর্ঘায়ু প্রদান করে। মাংসের নিজস্ব কোন স্বাদ নেই, তাতে তেল, ঝাল, মশালা আদি মেশালে তবেই সেটির স্বাদ হয় কিন্তু ফল, সবজী, মেওয়া ইত্যাদির স্বতন্ত্র নিজস্ব স্বাদ রয়েছে এবং মশলাপাতি ছাড়াও তা খাওয়া যায়।

পশুজগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, যেসব পশু সর্বাধিক শক্তিশালী, পরিশ্রমী এবং অধিক সহনশীল এবং বেশিদিন একনাগাড়ে কাজ করতে পারে, যেমন হাতি, ঘোড়া, বলদ, উট ইত্যাদি, এগুলি সবই শাকাহারী। ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক মাংসাহারী শিকারী কুকুরকেও যখন নিরামিষাশী করে রাখা হয়, তখন তার সহ্যশক্তি ও ক্ষমতা বাড়ে।

এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং শেরপাদের শক্তির রহস্য নিরামিষাশী হওয়া বলেই জানিয়েছেন। বহু আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ও আমিষ খাদ্য পরিত্যাগ করে নিরামিশাষী হচ্ছেন।

বহু গবেষক জানিয়েছেন নিরামিষাশী মানুষ বেশি সহনশীল, শক্তিশালী, পরিশ্রমী, শান্তস্বভাবযুক্ত এবং মিষ্ট স্বভাবের হয়। তারা অধিক সময় ক্ষুধা সহ্য করতে এবং উপবাস করার ক্ষমতা রাখে। জাপানে গবেষণা

করে জানা গেছে যে নিরামিষাশী ব্যক্তিগণ শুধু সুস্থ ও নীরোগই থাকেন না, তাঁরা দীর্ঘজীবি হন এবং তাঁদের বুদ্ধিও অপেক্ষাকৃত প্রখর হয়।

সুতরাং যারা একথা বলে যে, আমিষ খাদ্য নিরামিষের তুলনায় বেশি শক্তিবর্ধক, এটি তাদের ভুল ধারণা। National Institute of Nutrition, Hyderabad থেকে প্রকাশিত (Nutritive value of Indian Foods) বিভিন্ন খাদ্য পদার্থের যে তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে পাঠকেরা নিজ রুচি অনুসারে আমিষ আহারের পরিবর্তে বেশি পুষ্টিদায়ক নিরামিষ আহার বেছে নিতে পারেন।

**প্রতি ১০০ গ্রামে (%)**

| পদার্থের নাম | প্রোটিন | কার্বো. | ফ্যাট | ফাইবার | মিনারেলস | ক্যালোরী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গম | 12.1 | 69.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 341 |
| জব | 11.5 | 69.6 | 1.3 | 3.9 | 1.2 | 336 |
| বাজরা | 11.6 | 67.5 | 5.0 | 1.2 | 2.3 | 361 |
| ভুট্টা | 11.1 | 66.2 | 3.6 | 2.7 | 1.5 | 342 |
| ছোলা | 17.1 | 60.9 | 5.3 | 3.9 | 3.0 | 360 |
| চাল | 13.5 | 48.4 | 16.2 | 4.3 | 6.6 | 393 |
| সোয়াবীন | 43.2 | 20.9 | 19.5 | 3.7 | 4.6 | 432 |
| রাজমা | 22.9 | 60.6 | 1.3 | 4.8 | 3.2 | 346 |
| বিউলি ডাল | 24.0 | 59.6 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 347 |
| লোবিয়া | 24.1 | 54.5 | 1.0 | 3.8 | 3.2 | 323 |
| মুগ | 24.0 | 56.7 | 1.3 | 4.1 | 3.5 | 334 |
| মুসুর | 25.1 | 59.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 343 |
| মোঠ | 23.6 | 56.5 | 1.1 | 4.5 | 3.5 | 330 |
| অড়হর ডাল | 22.3 | 57.6 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 335 |
| ছোলার ডাল | 20.8 | 60.9 | 5.6 | 3.9 | 2.7 | 360 |
| মটর | 19.7 | 56.5 | 1.1 | 4.5 | 2.2 | 315 |
| চিনা বাদাম | 26.2 | 26.7 | 39.8 | 3.1 | 2.5 | 570 |

| পদার্থের নাম | প্রোটিন | কার্বো. | ফ্যাট | ফাইবার | মিনারেলস | ক্যালোরী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বাদাম | 20.8 | 10.5 | 58.9 | 1.7 | 2.9 | 655 |
| আখরোট | 15.6 | 11.0 | 64.5 | 2.6 | 1.8 | 687 |
| কাজু | 21.2 | 22.3 | 46.9 | 1.3 | 2.4 | 596 |
| পেস্তা | 19.8 | 16.1 | 53.5 | 2.1 | 2.8 | 626 |
| চিলগোজা | 13.9 | 29.0 | 49.3 | 1.0 | 2.8 | 615 |
| কিশমিশ | 1.8 | 74.6 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 308 |
| তিল | 18.3 | 25.0 | 43.3 | 2.9 | 5.2 | 563 |
| তরমুজের বীজ | 34.1 | 4.5 | 52.6 | 0.8 | 3.7 | 628 |
| নারকেল | 6.8 | 18.4 | 62.3 | 6.6 | 1.6 | 662 |
| খেজুর | 2.5 | 75.8 | 0.4 | 3.9 | 2.1 | 317 |
| মুনক্কা | 2.7 | 75.2 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 316 |
| আমলকি | 0.5 | 13.7 | 0.1 | 3.4 | 0.5 | 58 |
| কলা | 1.2 | 27.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 116 |
| আপেল | 0.2 | 13.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 59 |
| চেরী | 1.1 | 13.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 64 |
| আঙুর | 1.0 | 10.0 | 0.1 | — | 0.4 | 45 |
| পিয়ারা | 0.9 | 11.2 | 0.3 | 5.2 | 0.7 | 51 |
| লিচু | 1.1 | 13.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 |
| বেল | 1.8 | 31.8 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 137 |
| মৌসুম্বী | 0.8 | 9.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 43 |
| লেবু | 1.0 | 11.1 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 57 |
| কমলালেবু | 0.7 | 10.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 48 |
| শহতূত | 1.1 | 10.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 49 |
| ফলসা | 1.3 | 14.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 72 |
| আড়ু | 1.2 | 10.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 50 |
| পেঁপে | 0.6 | 7.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 32 |
| আম | 0.6 | 16.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 74 |
| রসভরী | 1.0 | 11.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 56 |

| পদার্থের নাম | প্রোটিন | কার্বো. | ফ্যাট | ফাইবার | মিনারেলস | ক্যালোরী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সিঙ্গারা | 13.4 | 68.9 | 0.8 | — | 3.1 | 330 |
| গাজরের পাতা | 5.1 | 13.1 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 77 |
| মূলোর পাতা | 3.8 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 28 |
| বথুআ | 3.7 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 30 |
| মেথী | 4.4 | 6.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 49 |
| পালং | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 26 |
| পুদিনা | 4.8 | 5.8 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 48 |
| বাঁধাকপি | 1.8 | 4.6 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 27 |
| টিন্ডা | 1.4 | 3.4 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 21 |
| ফুলকপি | 2.6 | 4.0 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 30 |
| ঢেড়স | 1.9 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 35 |
| বিন্‌স | 7.4 | 29.4 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 158 |
| আলু | 1.6 | 22.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 97 |
| টমাটো | 1.5 | 6.7 | 0.2 | 4.2 | 1.2 | 35 |
| মহিষের দুধ | 4.3 | 5.0 | 6.5 | — | 0.8 | 117 |
| গরুর দুধ | 3.2 | 4.4 | 4.1 | — | 0.8 | 67 |
| দই | 3.1 | 3.0 | 4.0 | — | 0.8 | 60 |
| ছানা | 18.3 | 1.2 | 20.8 | — | 2.6 | 265 |
| পনীর | 24.1 | 6.3 | 25.1 | — | 4.2 | 348 |
| ক্ষীর | 22.3 | 25.7 | 1.6 | — | 4.3 | 206 |
| স্কিমড মিল্ক পাউডার | 38.0 | 51.0 | 0.1 | — | 6.8 | 357 |
| ইস্ট (Dried Fruit) | 35.7 | 46.3 | 1.8 | — | — | 344 |
| মাখন | — | — | 81.0 | — | 2.5 | 729 |
| ঘী | — | — | 100.0 | — | — | 900 |
| রান্নার তেল | — | — | 100.0 | — | — | 900 |
| আখের রস | 0.1 | 9.1 | 0.2 | — | 0.4 | 39 |
| চিনি | 0.1 | 99.4 | — | — | 0.1 | 398 |
| মধু | 0.3 | 79.5 | — | — | 0.2 | 319 |

| পদার্থের নাম | প্রোটিন | কার্বো. | ফ্যাট | ফাইবার | মিনারেলস | ক্যালোরী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শূয়োরের মাংস (Pork) | 18.7 | — | 4.4 | — | 1.0 | 114 |
| পাঁঠার মাংস | 21.4 | — | 3.6 | — | 1.1 | 118 |
| ভেড়ার মাংস (Mutton) | 18.5 | — | 13.3 | — | 1.3 | 194 |
| গো মাংস (Beef) | 22.6 | — | 2.6 | — | 1.0 | 114 |
| বিভিন্ন প্রকারের মাছ | 8.9 to 76.1 | to 13.9 | 0.2 to 19.4 | — | to 27.5 | 59 to 413 |
| ডিম | 13.3 | — | 13.3 | — | 1.0 | 173 |

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে শাকাহারী পদার্থে প্রোটিন বা অন্যান্য স্বাস্থ্যবর্ধক বস্তু কম নেই। দেশের গরীব শিশুদের দুর্বলতার কারণ প্রোটিন খাদ্যের অভাব নয়, পর্যাপ্ত আহার না পাওয়াই হল তার কারণ।

[১]উপরোক্ত তালিকায় লক্ষ্যণীয় যে আমিষ পদার্থে ফাইবারের (ডাল, আনাজ ইত্যাদির উপরিভাগ) মাত্রা একেবারেই নেই আর এটি নিশ্চিত যে রোগ প্রতিরোধে ফাইবার (Fibre) খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভিটামিনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই ভিটামিনও শাকাহার বস্তুতে পাওয়া যায়।

Vitamin A—সবুজ সব্জী, গাজর, টম্যাটো, মূলোর পাতাতে পাওয়া যায়।

Vitamin B—এগুলিও সব্জী ও শস্যাদিতে পাওয়া যায়।

Vitamin C—সবুজ সব্জী, লেবু, পেয়ারা, আমলা, কমলালেবু, মুসম্বী আদিতে পাওয়া যায়।

Vitamin D—এটি পশু ও গাছপালা থেকে প্রাপ্ত খাদ্যে কিছু পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু এর আসল এবং সব থেকে উত্তম উৎস হল সূর্যের কিরণ।

Vitamin A—ঘি, মাখন ইত্যাদিতে বেশি মাত্রায় থাকে।

Vitamin K—সবুজ সব্জীতে পাওয়া যায়।

এভাবে প্রমাণিত হল যে, এই সমস্ত প্রকারের ভিটামিন—যা স্বাস্থ্যের জন্য

---

[১]Medical Basis of Vegetarian Nutrition, Published by K. C. Charitable Trust, Delhi.

প্রয়োজনীয়, সেসব সূর্য কিরণ এবং নিরামিষ খাদ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

African Research Foundation এর Dr. Anna Spoerry দ্বারা গবেষণায় জানা যায় যে Masai জন-জাতি—যারা অত্যধিক আমিষ আহার করে, তারা যদি দই বেশি খায়, তবে তাদের কোলেষ্ট্রল কম হয়ে যায়। তাঁর মতে দইয়ের ব্যাক্‌টিরিয়া কোলেষ্ট্রল বৃদ্ধি রোধ করে।

[১]নিরামিষ খাদ্যের গুণাবলী জেনে এখন পাশ্চাত্য দেশে নিরামিষ খাদ্য আন্দোলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে এবং আমেরিকাতে স্যালাড্‌ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সকলেই স্যালাড্‌ খেতে উৎসুক হয়েছেন। সব্জীর সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদি মিশ্রিত করে নানাপ্রকারের স্যালাড্‌ তৈরি করা হয়।

সান্ধ্য টাইমস্‌, নিউ দিল্লী, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ অনুসারে লণ্ডনে অবস্থিত প্রপার্টি ডিলার পরমজিৎ সিং, যিনি ছাত্রজীবনে ভাল এ্যাথলিট ছিলেন, প্রত্যহ দুহাজার বার দড়ি ঝাঁপ করেন, তাঁর বক্তব্য এই শক্তি তিনি রুটি থেকে পান। তিনি পূর্ণরূপে একজন নিরামিষাশী।[২]

বিট্রেনে এখন প্রাচীন, আধুনিক বহু ব্যক্তিই নিরামিষাশী। সেখানে দশলাখের বেশি মানুষ এখন পূর্ণতঃ নিরামিষ আহারী এবং তা ক্রমশঃ আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু ব্রিটেনেই ১০০০এর বেশি হেলথ ফুড শপ আছে, যেখানে শুধুমাত্র নিরামিষ খাদ্য পাওয়া যায়।

আমেরিকাতে নিরামিষাশীর (Pure Vegeterian) সংখ্যা পাঁচ কোটিতে পৌঁছেছে।

নিরামিষ আহারের পুষ্টির ওপর সান্ধ্য টাইম্‌সে উধৃত নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৬৫ তে এভারেষ্ট শৃঙ্গে পতাকা উত্তোলনকারী ক্যাপ্টেন মোহন সিং কোহলীর পিতা সর্দার সুজান সিং কোহলী ৯২ বছর বয়সে বিনা চশমায় কাগজ পড়তেন, বাসে করে বিনা কষ্টে ভ্রমণ করতেন। কিছু দিন আগে তাঁর

---

[১]অহিংসা সন্দেশ, জুন ৮৯. পোষ্ট বক্স নং ৮৫, রাঁচী।

[২]Role of Vegetarian Diet in Health & Diesease, Bombay Hospital, Institute of Medical Science & Medical Research Centre, Bombay Hospital Trust, Bombay.

যে দাঁত পড়ে গিয়েছিল, তা আবার নতুন করে বেরিয়েছে। দিল্লীবাসী, সর্দার সুজান সিং, তাঁর জীবন রহস্যের কারণ নিরামিষ খাদ্য বলে জানিয়েছেন।

[১]পরমবীর চক্র বিজেতা নায়ক যদুনাথ সিংহ, যিনি ১৯৪৮ এ কাশ্মীরে তাঁর অদ্ভুত পরাক্রম ও শৌর্য দ্বারা একাকী বহু পাকিস্তানী হানাদারকে বধ করেছেন, তিনি নিরামিষ ভোজী ছিলেন। ফৌজের মধ্যেও তিনি নিরামিষ ভোজী ছিলেন, অন্য সকলেই আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করতেন। একবার এক ইংরেজ অফিসার বলেছিলেন যে, ইনি নিরামিষাশী হলে যুদ্ধ করবেন কী করে ? তাতে যদুনাথ বলেছিলেন, নিরামিষ খাদ্য বেশি পুষ্টিকর, আপনি যে কোন দুজন আমিষাশীর সঙ্গে আমাকে কুস্তি করতে দিন, যদি আমি জিতি, তবে আমাকে নিরামিষ খাদ্য অধিক পরিমাণে দেবেন, আর হারলে আমিষ খাদ্য গ্রহণ করব। কুস্তিতে যদুনাথই জিতেছিলেন এবং ইংরেজ অফিসার শুধু নিরামিষ খাদ্যেরই অনুমতিই দেননি, তিনি নিরামিষ খাবারের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, তিনিও এবার থেকে নিরামিষাশী হবেন।

**Evening Times, New Delhi 19 Feb. 1990** ; খাদ্য নিয়ে অনুসন্ধানকারী আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ কয়েক বছর গবেষণার পর ফল, সব্জী, দুধ এবং অন্য খাদ্যে পোষক তত্ত্বের প্রভাব সম্বন্ধে জেনেছেন এবং খাদ্যের দ্বারাই ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি অসাধ্য রোগের চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করছেন। কয়েকজন ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন যে আঙ্গুর, পেঁপে, আম, তরমুজ, টম্যাটো, সবুজ সব্জী খেলে পেট এবং অন্ত্রের ক্যান্সারের সম্ভাবনা কম হয়। ক্যান্সারের একটি কারণ হল আমিষ খাদ্য ভক্ষণ। দুধ পান করলে অন্ত্রের ক্যান্সার থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আমেরিকার যেসব মহিলা শাকাহারী, তাঁদের বক্ষের ক্যান্সার হয় না, যারা মাংসাহারী তাদের বেশি বক্ষ ক্যান্সার হয়। হার্ভার্ড এর অধ্যয়ন অনুসারে পশু মাংস এবং গর্ভ ক্যান্সারের পরস্পর সম্পর্ক আছে বলে জানানো হয়েছে।

---

[১]Source : TV Programme Title Paramvir Chakra, 9 A.M. on Sunday the 22nd July 1990.

জার্মানীর Institute of Social Medicine and Epidemiology দ্বারা ১৯৮৫-সালের গবেষণার রিপোর্ট **Hindusthan Times, New Delhi, 22.02.91** তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, নিরামিষাশীদের রক্তে ইউরিক এ্যাসিডের মাত্রা কম থাকে এবং তাদের কিডনী ভালোভাবে কাজ করে, তাদের সাধারণ রক্ত চাপ এবং কোলেষ্টরল এর সীমা আমিষাশীদের থেকে অনেক ভালো। নিরামিষাশীদের খাদ্য তাদের অনেক বেশি সুস্থ ও নীরোগ রাখে।

———o———

## (৫) আর্থিক দিক থেকেও নিরামিষ খাদ্য সাশ্রয়কারী

একথা প্রায়ই বলা হয় যে ডিমে অত্যন্ত কম খরচে প্রোটিন এবং পুষ্টি পাওয়া যায়, কিন্তু এটি মিথ্যাপ্রচার। বিভিন্ন পদার্থে প্রোটিনের পরিমাণ পূর্বের 19 পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। সেই অনুসারে এক গ্রাম প্রোটিনের দাম এইরূপ ঃ

| [১]পদার্থ | ১ গ্রাম প্রোটিনের দাম |
|---|---|
| ডিম | ১৪ পয়সা |
| গম | ৪ পয়সা |
| ডাল | ৩ পয়সা |
| সোয়াবীন | ২ পয়সা |

ক্যালোরীর দৃষ্টিতে দেখলে ১০০ ক্যালোরীতে এইরূপ ব্যয় হয় ঃ—

| পদার্থ | ১০০ ক্যালোরীতে খরচ |
|---|---|
| ডিম | ৯০ পয়সা |
| গম | ৯ পয়সা |
| ডাল | ৮ পয়সা |
| সোয়াবীন | ৫ পয়সা |

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে ডিমের থেকে ডাল ও আনাজে অত্যন্ত কম খরচে বেশি প্রোটিন এবং ক্যালোরী পাওয়া যায়, এছাড়া অন্যান্য

[১]ডিম ঃ জহর হী জহর (শুধুই বিষ) লেখক ডাঃ নেমীচাঁদ জৈন, ইন্দোর।

প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদিও উপরন্তু পাওয়া যায়, যা মাংসাহারে প্রায় থাকেই না।

ভারত সরকারের হেলথ বুলেটিন No. 23 তে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে বনস্পতি খাদ্যের গুণ (Calorie Value) পশু (মাংস) খাদ্যের থেকে অনেক বেশি।

[১]আর্থিক দৃষ্টিতেও এই তথ্য প্রমাণিত হয় যে, মাংস থেকে এক কিলো প্রোটিন পেতে গেলে পশুকে ৭ থেকে ৮ কিলো প্রোটিন খাওয়াতে হয়। এও অনুমান করা হয় যে ১ পশুমাংস ক্যালোরী পাওয়ার জন্য ৭ বনস্পতি ক্যালোরী খরচ হয়। আমেরিকার কৃষি বিভাগ যে তথ্য তৈরী করেছে তাতে জানা যায় যে, একটি পশুচারণের জন্য যতটা জমি লাগে, সেই জমিতে পাঁচটি পরিবারের পালন হতে পারে।

গড়ে একজন আমেরিকান প্রতি বছর প্রায় ১২০ কিলো মাংস খায়, তার জন্য প্রতি বছর প্রায় এক টন আনাজ খরচ হয়। যদি সে (directly) ১২০ কিলো আনাজ খায়, তাহলে বছরে আটজন ব্যক্তির পালন হতে পারে। প্রফেসর জর্জ বোর্গষ্টোর্ম মনে করেন যে শুধু আমেরিকাতে পশুরা যতো বনস্পতি খাদ্য খরচ করে, তাতে বিশ্বের অর্ধেক মানুষের পেট ভরা সম্ভব। [২]Surrey, U. K. এর Mr. Nitin Mehta-র কথা অনুসারে আমেরিকা ও ইউরোপের 90 % কৃষি জমি পশু-খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। একটি পশুর আহারের 90 % প্রোটিন তার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়, কেবল 10% ই মাংসের রূপে অবশিষ্ট থাকে। মাংসাহারে পশুর 44 % ভাগই কাজে লাগে। এইভাবে পশুকে খাওয়ানো প্রতি ১৬ কিলো আনাজের পরিবর্তে কেবল ১ কিলো মাংস পাওয়া যায়। সোজাসুজি আনাজ আহার করলে মানুষের যতটা চাষের জমি প্রয়োজন, মাংস আহার করার জন্য পশুর আহারের জন্য তার ১৪গুণ বেশি কৃষি ভূমির প্রয়োজন হয়।

———○———

[১]Human onchogene : Work done by Prof. R. A. Weinberg from Massachutts Hospital, U. S. A. and others.

[২]Ahinsa Voice, July 89, Published by Sharman Sahitya Sansthan, Delhi

## (৬) মানব-জীবনে পশুর প্রয়োজনীয়তা

মানুষ এবং পশু একে অপরের আশ্রিত অথবা একে অপরের পরিপূরক। মানুষ যদি একটি পশুপালন করে, তবে সেই পশু তার সারা পরিবারকে পালন করে এবং নানাভাবে তাদের সেবা করে।

টাঙ্গাওয়ালা একটি টাট্টুর সাহায্যে পুরো পরিবারের পালন করে। বলদটানা গাড়িওয়ালা বলদের সাহায্যেই সংসার প্রতিপালন করে। মেষপালকগণ পশু থেকে দুধ, ঘি, উল আদি সাহায্যে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে বংশানুক্রমিক ফুসফুসের রোগেও মেষের দুধ খুবই উপকারী। বহু ব্যক্তি বিভিন্ন পশু পালনের দ্বারা নিজেদের আহারের সংস্থান করে এবং তাদের সাহায্যেই জীবন কাটায়।

[১]ভূতপূর্ব কৃষিমন্ত্রী শ্রীবুটা সিং সংসদে বলেছিলেন যে 'ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কসাইখানায় প্রতি বছর ২০ লক্ষ পশু হত্যা করা হয়। অন্যান্য বেআইনী কসাইখানায় তারও বেশি পশুহত্যা করা হয়।' প্রতিবছর ২০ লক্ষ পশু হত্যা করার অর্থ প্রতি বছর এক কোটি টন গোবর ও গোমূত্র অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি টন প্রাকৃতিক সার না পাওয়া, যা উৎপাদন করতে কোনো পয়সা লাগে না অর্থাৎ বিনামূল্যেই পাওয়া যায়।

শ্রীবুটা সিংয়ের বক্তব্য অনুসারে আনাজের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হল রাসায়নিক সারের মূল্যবৃদ্ধি 'Fertiliser is the costliest input'. রাসায়নিক সারের পরিবর্তে যদি বিনামূল্যে পাওয়া গোবর সার প্রয়োগ করা যায়, তাহলে সব্জীর দাম অনেক কমে যাবে এবং রাষ্ট্রের সার উৎপাদনে প্রতিবছর যে অনুদান (subsidy) দেওয়া হয়, সেটিও বাঁচবে। তাছাড়া রাসায়নিক সারে খরচ হওয়া বিদেশী মুদ্রা বাঁচবে এবং সার উৎপাদনে ব্যয় করা অর্থকেও (capital invested in fertiliser projects) অন্য কাজে লাগানো যাবে।

একটি গরু কত মানুষকে আহার দেয়, তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। যদি

---

[১]অহিংসা সন্দেশ, জুলাই ৮৯, রাঁচী।

ধরা হয় একটি গোরু প্রতিদিন প্রায় ১০কিলো দুধ হিসাবে গড়ে ১০মাস পর্যন্ত দুধ দেয়, তাহলে সেটি বছরে ৩০০০ কিলো দুধ দিয়ে প্রায় ৬০০০ ব্যক্তিকে একবার তৃপ্ত করতে পারে। সে যদি গড়ে ১৫ বছর দুধ দেয়, তাহলে একটি গোরু তার জীবনকালে নব্বই হাজার মানুষকে একবার তৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু যদি তাকে হত্যা করে তার মাংস খাওয়া যায়, তবে তাতে এক হাজার মানুষেরও একদিন পেট ভরতে পারে না। ছাগল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা। এইভাবে একটি বলদ তার জীবনকালে কমপক্ষে ৪০০০০ কিলো অন্ন উৎপন্ন করে প্রায় ষাট হাজার মানুষকে একবার তৃপ্ত করতে পারে। অধিকন্তু গাড়ি, যাত্রী ও মালবহন করা ইত্যাদির পরিষেবা আলাদা ও তৎসম্বন্ধীয় খরচ এতে ধরা হয়নি। এই সব পশুদের গোবর থেকে জ্বালানী, সার, গ্যাস ইত্যাদি অতিরিক্ত যেসব বস্তু পাওয়া যায়, সেসব যদি হিসাব করা হয়, তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে এই পশুদের হত্যা করে আমরা ততটাই লাভ করি যতটা চা তৈরি করার জন্য টাকার নোট পোড়ালে হয়। প্রত্যহ স্বর্ণ-অণ্ড প্রসবকারী হাঁসকে হত্যা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

জল পরিষ্কার রাখার জন্য মাছের ভূমিকা অধিকাংশ ব্যক্তিই জানেন। সান্ধ্য টাইমস, নিউ দিল্লী, ১২.০৪.৯০ তে প্রকাশিত হয় যে, ভোপালে মৎস্য দ্বারা ম্যালেরিয়া ধ্বংস করার কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, যেখানে পুকুর বা নোংরা জলের গর্ততে নানা প্রজাতির ২৫ হাজার মাছ ছাড়া হয়েছে। এই সব মাছ মশাদের লার্ভা অর্থাৎ একেবারে প্রারম্ভিক অবস্থাতেই নষ্ট করে দেয় এবং পরিবেশের দূষণ রোধে সাহায্য করে।

নবভারত টাইমস ১১.০৫.৯০ এ প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে বাঁদর রাসায়নিক কীটনাশকের তুলনায় ফসল রক্ষা করতে বেশি সক্ষম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সরকারের রিপোর্ট অনুসারে একটি পেঁচা প্রত্যহ কমপক্ষে দুটি ইঁদুর এবং ফসল নষ্টকারী বহু কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে। এইভাবে পেঁচা একটি ক্ষেতে তিন হাজার ডলার মূল্যের চাল রক্ষা করে।

বম্বে হ্যুমেনেটরিয়ান্ লীগের অনারারী সেক্রেটারী দশরথ ভাই ঠক্করের মতানুসারে পশুজগৎ আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদে প্রতিবছর ২৫,৫০০ কোটি টাকার দুধ, সার, জ্বালানী এবং ভারবহনের কাজ করে, নিজেরা কষ্ট সহ্য

করে আমাদের রাষ্ট্রকে সেবা করে। তাছাড়া এদের মৃত্যুর পর এদের চর্ম ও অস্থি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। যারা আমাদের এতো সম্পদ দেয়, এতভাবে সেবা করে, আমাদের তো সেই পশুদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ! তা না করে আমরা যদি এদের কসাইখানাতে পাঠাই, তবে সেটি হবে আমাদের কৃতঘ্নতারই প্রকাশ।

পশু-বধ রোধ হলে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ লাভ ছাড়া যে অপ্রত্যক্ষ লাভ হয় তা-ও কম নয়। সস্তা সার পেলে সব্জী সস্তা হবে, সব্জী সস্তা হলে গরীব পূর্ণ আহার পাবে, যাতে অনাহার থেকে হওয়া অসুখ কমবে এবং তারজন্য তার ওষুধের খরচও কমবে। আনাজ সস্তা হলে মূল্যবৃদ্ধির সূচক হ্রাস পাবে, দুর্মূল্য ভাতা কমবে। শ্রমিক আন্দোলন, হরতাল কম হবে এবং তাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও বস্তুর দাম কমবে। উৎপাদন বৃদ্ধি হলে রাষ্ট্রীয় আয় বাড়বে এবং রাষ্ট্রকে বিদেশের কাছে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

সুতরাং পশুহত্যা রোধ করা শুধুমাত্র ধার্মিক, নৈতিক বা দয়ার বিষয় নয়, এতে রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি ও স্বাস্থ্য রক্ষারও প্রয়োজন মিটতে পারে। শুধুমাত্র পশু রক্ষার মাধ্যমেই আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান এবং প্রত্যেক দেশবাসীর জীবনমান উন্নত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিজের সুরক্ষা ও সুখ আকাঙ্ক্ষাকারীর অপরেরও সুরক্ষা ও সুখ প্রদান করতে শেখা উচিত, নচেৎ প্রকৃতির শাস্তিপ্রদানের নিজস্ব নিয়ম আছে। যেভাবে জঙ্গল নষ্ট হওয়ায় পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং আমরা বন সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে নিজেদের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করি, সেইভাবে আমাদের অস্তিত্ব এবং (Environment & Ecological) পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সাম্য ঠিক রাখার জন্য পশু-পক্ষী বাঁচাও আন্দোলন করতে হবে। এই কাজে যত দেরী হবে, ক্ষতির পরিমাণ ততই বাড়বে।

আমাদের মঙ্গল এতেই যে আমরা যেন **'মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি'** (Do not inflict injury on any creature)—এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করি।

Let all be happy without any pain or misery.

———o———

# (৭) আমিষ আহার অসুখের জন্মদাতা

আমিষ খাদ্য কত প্রাণঘাতী এবং কত অসাধ্য রোগকে আমন্ত্রণ করে —এই বিষয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তা একবার দেখা উচিত।

[১]State University of New York, Buffalo তে করা গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, আমেরিকাতে মাতা-পিতা মাংসাহারী হওয়ায় ৪৭০০০ হাজারের বেশি শিশু প্রতি বছর কোনও না কোনও অসুখ নিয়ে জন্মায় এবং বড় হলেও সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয় না।

[২]1885 এ নোবেল বিজয়ী আমেরিকান ডাক্তার মাইকেল. এস. ব্রাউন এবং ডাক্তার জোসেফ.এস.গোল্ডষ্টীন প্রমাণ করেছেন যে, হৃদ্‌রোগ থেকে বাঁচার জন্য কোলেষ্টেরোলের বৃদ্ধি রোধ করা অতি আবশ্যক, এটি বনস্পতিতে না থাকারই মত। ডিমে এটি সর্বাধিক পরিমাণে থাকে এবং মাংস ও পশু থেকে প্রাপ্ত খাদ্যেও এটি অধিক মাত্রায় থাকে। যে ব্যক্তি মাংস বা ডিম খায় তার শরীরে 'রেস্পটরের' সংখ্যা কম হয়ে যায় যাতে রক্তে কোলেষ্টরেলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাতে হৃদ্‌রোগ, কিডনীর অসুখ এবং গলব্লাডারে স্টোন ইত্যাদি রোগের উপসর্গ দেখা দেয়।

বিট্রেনের ডাক্তার এম. রক এক গবেষণার পর জানিয়েছেন যে 'শাকাহারীদের মধ্যে সংক্রামক এবং প্রাণঘাতী অসুখ মাংসাহারীদের থেকে কম হয়। তারা মাংসাহারীদের থেকে বেশি সুস্থ, শ্রীযুক্ত চেহারাসম্পন্ন, শান্ত প্রকৃতি এবং চিন্তাশীল হয়।'

বি.বি.সির টেলিভিশান বিভাগ প্রচারিত শাকাহারের এক সাপ্তাহিক কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে মাংসাহারীদের স্পষ্ট সতর্ক করা হয় যে, 'এর দ্বারা

---

[১]অহিংসা সন্দেশ, জুন ৮৯, রাঁচী

[২] কল্যাণ, গোরখপুর, ৫৭১ পাতা ও Hindustan Times, New Delhi 01.10.86 & Human onchogene : Work done by Prof. R. A. Weinberg from Massachutts Hospital, U. S. A. and others.

আপনি প্রাণঘাতী রোগের সম্মুখীন হতে পারেন।'

পশ্চিমী দেশে যেখানে মাংসাহার অত্যধিক প্রচলিত, সেখানে হার্ট এ্যাটাক, ক্যান্সার, ব্লাড প্রেশার, মেদবৃদ্ধি, কিডনীর অসুখ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, সংক্রামক ব্যাধি, লিভারের উপসর্গ, স্টোন ইত্যাদি প্রাণঘাতী অসুখ বেশি হয়। অথচ ভারত, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা আদি দেশে— যেখানে মাংসাহারের প্রচলন কিছুটা কম, সেখানে এই সকল তত বেশি পরিমাণে হয় না।

[১]হুজা নামক জনবসতীর ৯০ থেকে ১১০ সাল পর্যন্ত বয়সের লোকেদের অধ্যয়ন করার পর জানা যায় যে তাদের এতো বেশি বয়স এবং সুস্থ থাকার কারণ হল নিরামিষাশী হওয়া।

গোয়ালিয়রের দুই গবেষক ডা. জসরাজ সিংহ এবং শ্রী. সী. কে. ডবাস গোয়ালিয়র জেলের ৪০০ বন্দীর ওপর গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, ২৫০ আমিষাশীদের মধ্যে ৮৫ % খিটখিটে ও ঝগড়াটি স্বভাবের এবং অবশিষ্ট ১৫০ নিরামিষাশী বন্দীর মধ্যে ৯০ % শান্ত ও মিষ্ট স্বভাববিশিষ্ট।

[২]আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডা. উইলিয়ম. সী. রবার্টস বলেছেন যে আমেরিকাতে মাংসাহারী লোকেদের মধ্যে হৃদ্‌রোগীর সংখ্যা অধিক, সেই তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে হৃদ্‌রোগীর সংখ্যা কম।

আমেরিকান ডাক্তারদের আরও বক্তব্য হল যে আমিষ খাদ্যের তুলনায় নিরামিষ খাদ্যে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি থাকে। আমিষাশীদের প্রায়শঃই কোষ্ঠ-কাঠিন্য দেখা যায়, যাতে বহু রোগ স্বতঃই আক্রমণ করে।

[৩]অন্য আরেকটি রিপোর্ট অনুসারে একপ্রকার কীট যাকে Brain Bug বলা হয়, সেটি কামড়ালে পশু পাগল হয়ে যায়। কিন্তু এই রোগ পূর্ণভাবে প্রকাশ পেতে ১০ বছর সময় নিয়ে থাকে। এর মধ্যে যদি কেউ এই পশুর মাংস খায় তবে সেই পশুর গুপ্ত রোগ মাংসাহারীর শরীরে প্রবেশ করে।

সকলেই জানেন যে হত্যা করার আগে পশু-পক্ষী বা মৎস্য ইত্যাদির কোনও প্রকারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় না এবং তাদের দেহের অসুখের কথাও জানা যায় না। ডিম, পশু, পক্ষী, মৎস্যাদিও ক্যান্সার, টিউমার ইত্যাদি

---

[১-৩]অহিংসা সন্দেশ, জুন ৮৯, রাঁচী

রোগগ্রস্ত হয় এবং তাদের মাংস খেলে মানুষেরও সেই রোগ হওয়ার আশংকা থাকে।

[১] শুধু আমেরিকাতেই 40000 এর বেশি কেস প্রতিবছর পাওয়া যায় যা রোগগ্রস্ত ডিম বা মাংস খেলে হয়।

[২] Health Education Council অনুসারে বিষাক্ত আহারে হওয়া 90% মৃত্যুর কারণ হল মাংসাহার।

[৩] পশু যখন কসাইখানায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন সে কেঁপে ওঠে। মৃত্যুকে সম্মুখীন দেখে সেই পশু ২।১ দিন আগে থেকেই খাওয়া বন্ধ করে। ভয়ে তার পায়খানার কিছুটা বেরিয়ে যায়। দেহের মল যখন রক্তের সংস্পর্শে আসে তখন তা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মাংসে রক্ত, বীর্য, মল, মূত্র ইত্যাদি নানা বস্তুর অংশ থাকে ! মৃত্যুর পূর্বে অসহায় পশু আত্মরক্ষার জন্য ছটফট করতে থাকে। এসব অর্থহীন হয়ে গেলে তার ভয় বৃদ্ধি পায়, রাগে চোখ লাল হয়ে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা পড়তে থাকে। এই অবস্থায় তার দেহে Adrenalin উৎপন্ন হয়, যাতে তার রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং তার মাংস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মানুষ সেই মাংস খেলে তার মধ্যে Adrenalin প্রবেশ করে তাকে প্রাণঘাতী রোগের শিকার করে। Adrenalin এর সঙ্গে যখন Chlorinated Hydrocarbon নেওয়া হয়, তখন সেটি সম্ভাব্য প্রাণঘাতী হার্ট এ্যাটাক করে জীবন সংশয়যুক্ত করে।

মাছ, ডিম ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য Boric Acid বা বিভিন্ন বোরেট্স ব্যবহৃত হয়। এই কম্পাউণ্ডগুলি Cerebal Tissues তে একত্রিত হয়ে গভীর বিপদ উৎপন্ন করে।

সকলেই জানেন যে রক্তে ব্যাকটিরিয়া শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। মাংসে রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় তাতে Bacteria-র Infection শীঘ্রই বৃদ্ধি পায়। পশুর মৃত্যু হলেই মাংস পচতে শুরু করে এবং শাকাহার পদার্থের তুলনায় তা অতি

---

[১] অহিংসা সন্দেশ, জুন ৮৯, রাঁচী

[২] Food for a future, Published. by Akhil Bharatiya Hinsa Nivaran Sangha, Ahmedabad.

[৩] Hindustan Times, New Delhi, 01.10.1986

শীঘ্র পচতে থাকে। এরূপ মাংস—যা মৃতদেহ খাবারই মতো, তা যখন ভক্ষণকারীর শরীরে প্রবেশ করে, তখন সেটি এমন অসাধ্য রোগের জন্ম দেয় যা মাংসাহারীকে অন্তিম সময় পর্যন্ত রেহাই দেয় না। আজ যে মাংস ভক্ষণ করে, কিছুদিন পর সেই মাংসই তাকে ভক্ষণ করে।

কসাইখানার মাংস যে কতো ক্ষতিকারক, দূষিত, রোগগ্রস্ত হয় তা অনুমান করা যায় এই থেকে যে ইউরোপের অত্যাধুনিক, নতুন টেকনিক দ্বারা সঞ্চালিত কসাইখানাকেও স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে আদর্শ বলা হয় না, তখন ভারতের কসাইখানার মাংসের আর কথাই কী !

মাংসাহারের সঙ্গে অসাধ্য রোগের যে সম্পর্ক, তার অনুসন্ধানের পরিণাম কিছুটা এইরূপ—

(১)জার্মানীর প্রোফেসর এগ্‌নরবর্গের বক্তব্য হল ডিম 51.83% কফ উৎপন্ন করে। এটি শরীরের পোষক তত্ত্বের অনুপাতকে নষ্ট করে।

(২)আমেরিকান ডাঃ ই. বি. এমারী এবং ইংল্যাণ্ডের ডাঃ ইন্‌হা, তাঁদের বিশ্ববিখ্যাত বই ‘পুষ্টির নবীনতম জ্ঞান’ এবং ‘রোগীদের প্রকৃতি’তে স্পষ্ট বলেছেন যে ডিম মানুষের পক্ষে বিষতুল্য।

(৩)ইংল্যাণ্ডের ডাঃ আর. জে. উইলিয়াম বলেছেন যে ‘সাধারণতঃ ডিমভক্ষণকারী প্রথমে বেশি শক্তি অনুভব করে, কিন্তু পরে তাদের হৃদ্‌রোগ, এক্‌জিমা, প্যারালিসিস ইত্যাদি ভয়ানক রোগের শিকার হতে হয়।

(৪)পরীক্ষায় জানা যায় যে ডিম যদি ৮°c এর বেশি তাপে ১২ ঘণ্টার বেশি সময় থাকে, তবে তাতে পচনক্রিয়া শুরু হয়। এই অবস্থায় ভারতের মতো দেশে, যেখানে তাপমাত্রা সর্বদা ৮°c এর চাইতে বেশি থাকে এবং পোল্ট্রী ফার্মে ডিম উৎপন্ন হয়ে বিক্রী হওয়া পর্যন্ত সেটি ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় বাইরে থাকে, এর ফলে তাতে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কারণ উৎপন্ন হওয়ার পর বিক্রয় পর্যন্ত ডিমকে রেফ্রিজারেটরে রাখা কখনও সম্ভব নয়। ডিম পচতে থাকলে প্রথমে তার জলীয় অংশ খোলস থেকে বাষ্প হয়ে উবে যায়, তারপর রোগ সংক্রমণ হতে থাকে এবং হলুদ অংশে গিয়ে পুরো প্রভাব বিস্তার করে। সূক্ষ্মস্তরে পচন ধরায় সেটি ঠিকভাবে বোঝা যায় না এবং উদরস্থ

(১-৪)ডিম ঃ জহর হী জহর, issued by Heera Bhaiya Prakashan. Indore

করা হয়। তার ফলে পেটের রোগ, Food Poisoning ইত্যাদি হয়।

[১]ইংল্যাণ্ডের শ্রীনীতিন মেহতার বক্তব্য অনুসারে প্রতিবছর প্রায় ৫০লাখ মানুষ Salmonella দ্বারা প্রভাবিত হন। N. H. S. অনুসারে মুরগী বা ডিম থেকে হওয়া Food Poisoning প্রভাবগ্রস্থ রোগীদের চিকিৎসায় প্রতি বছর ২০ লাখ ডলার খরচ হয়।

[২] Salmonella ছাড়া Listeriaও ছড়িয়ে পড়ে, যা ফ্লু উৎপন্ন করে এবং যার থেকে Meningitis (Brian swelling) বা Food Poisoning বৃদ্ধি পায়। তাতে গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত বা গর্ভস্থ শিশুর রোগগ্রস্ত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। স্বাস্থ্য বিভাগের সূচনা অনুসারে ১২% 'Ready to eat poultry food'-এর নমুনাতে Listeria পাওয়া গেছে। Creutzfeldt Jacob's disease, Beef থেকে উৎপন্ন হয়, যা হল একটি মানসিক রোগ যা ভেড়ার মধ্যে পাওয়া অসুখ Scrapie র মতো। এই অসুখ মাংসাহার দ্বারা পশুর দেহ থেকে মানুষে প্রবেশ করার সম্পর্ক জানা গেছে।

[৩]Australia, যেখানে সর্বাধিক মাংসাহার করা হয় এবং যেখানে গড়ে প্রতি ব্যক্তি প্রতি বছর 130 K.G. Beef ভক্ষণ করে, সেখানে Bowel Cancer সর্বাধিক। Dr. Andrew Gold তাঁর পুস্তক Diabetes : Its Causes and Treatment এ শাকাহার ভোজনেরই পরামর্শ দিয়েছেন।

আমিষ আহার যেসব অসাধ্য রোগের জন্ম দেয় সম্প্রতি এই বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে করা অনুসন্ধানের তালিকা হল এইরূপ—

[৪]**হৃদরোগ এবং উচ্চরক্তচাপ**—রক্তের শিরার দেওয়ালের গায়ে কোলেষ্টরল জমা হওয়া হল এর প্রধান কারণ। কোলেষ্টরল এর সর্বাধিক স্রোত ডিম, তারপর মাংস, মাখন ও ঘি। ১০০ গ্রাম ডিম প্রতিদিন গ্রহণ করলে প্রয়োজনের তুলনায় ২ ১/২ গুণ বেশি কোলেষ্টরল সংগ্রহ করা হয়।

---

[১-২]Ahinsa Voice, July 89, Published by Sharman Sahitya Sansthan, Delhi.

[৩]Role of Vegerarian Diet in Health and Disease, Bombay.

[৪]Medical Basis of Vegetarian Nutrition, New Delhi.

(১)**মৃগী (Epilpsy)**—বিষাক্ত মাংস ও না-ধোওয়া সব্জী খেলে হয়।

(২)**অন্ত্রের আলসার, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, অন্ত্র ও মলদ্বারের ক্যান্সার**—এই সব রোগ নিরামিষাশীদের তুলনায় আমিষাশীদের অধিক হয়।

(৩)Kidney Disease— বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার Kidney নষ্ট করে। নিরামিষ খাদ্য Palatable হওয়ায় পেট শীঘ্র ভরে, তাই মানুষ তাতে প্রয়োজনের বেশি প্রোটিন পায় না, মাংসাহারে সহজেই প্রয়োজনের বেশি প্রোটিন গ্রহণ করা হয়।

(৪)Rheumatoid artheritis, gout and other type of astheritisis—মাংসাহারে রক্তে ইউরিক এ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে, যাতে অস্থির সংযোগে এটি জমতে থাকলে উপরোক্ত রোগ হয়। মাংস, ডিম, চা, কফি ইত্যাদি না খেলে এই অসুখ কমে যায়।

(৫)Atherosclerosis—রক্তের শিরা মোটা হয়। এর কারণ খাদ্যে পোলিস্যাচুরেটেড ফ্যাট, কোলেষ্টরল এবং ক্যালরিজ এর আধিক্য। আমিষ খাদ্যে এই সব পদার্থ বেশি থাকে, নিরামিষ খাদ্যে তা অত্যন্ত কম থাকে। সব্জী ও ফলে এসব না থাকারই মতো। তাই নিরামিষ খাদ্য এই রোগ থেকে রক্ষার সহায়ক হয়।

(৬)Cancer —এই প্রাণঘাতী রোগ মাংসাহারীর তুলনায় নিরামিষ আহারীদের খুবই কম হয়।

(৭)**অন্ত্রের পচন**—ডিম, মাংস ইত্যাদি ভক্ষণ করলে পেটের নানাপ্রকার অসুখ হয়, যাতে আমাশয় দুর্বল হয় এবং অন্ত্রে পচন ধরে।

(৮)**রোগ প্রতিরোধক শক্তির ক্ষয়**—মাংস, ডিম আহার করলে শরীরের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, শরীর সাধারণ রোগও প্রতিরোধ করতে পারে না, বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিও কমে যায়, বিকাশ অবরুদ্ধ হয়। কিছু আমেরিকান ও ইংল্যাণ্ডের ডাক্তার ডিম মানুষের পক্ষে বিষের মতো ক্ষতিকারক বলে জানিয়েছেন।

(৯)**চর্ম রোগ, একজিমা, ব্রণ ইত্যাদি**— চর্ম রক্ষার জন্য Vitamin A

---

(১-৬ এবং ৯)Medical Basis of Vegetarian Nutrition, New Delhi.

(৭-৮) ডিম ঃ জহর হী জহর (শুধুই বিষ)—ড. নেমীচাঁদ জৈন, ইন্দোর

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এগুলি গাজর, টম্যাটো, সবুজ আনাজ-এ বেশি পাওয়া যায়। নিরামিষ খাদ্য ত্বকের পুষ্টি বৃদ্ধি করে। অন্য পক্ষে মাংস-ডিমে চর্মরোগ বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ মাংসাহারী ব্যক্তির ত্বকের জ্বালা ইত্যাদি রোগ দেখা যায়।

[১]**অন্যান্য অসুখ যেমন**—মাইগ্রেন, ইন্‌ফেকশন থেকে হওয়া রোগ, নারীদের মাসিক সম্পর্কিত রোগও আমিষাশীদের মধ্যে বেশি হয়।

সারাংশ হল, নিরামিষ খাদ্য যেখানে প্রায় প্রতিটি অসুখের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, আমিষ খাদ্যে অসুখগুলি সব বৃদ্ধি পায়। নিরামিষাশী হলে আয়ু বৃদ্ধি পায় আর আমিষাশী হলে আয়ুর হ্রাস হয়।

———○———

## (৮) কোনো ডিমই নিরামিষ নয়

ডিম দুপ্রকারের—একটি থেকে বাচ্চা হয়, অন্যটিতে বাচ্চা জন্মায় না। মুরগী মোরগের সংসর্গে না গেলেও পরিণত বয়সে ডিম পাড়তে পারে। এর তুলনা নারীদের রজঃস্রাবের সঙ্গে করা যায়। নারীদের যেমন মাসিক ধর্ম হয়, মুরগীদের ক্ষেত্রে সেটি ডিমরূপে হয়। এই ডিম মুরগীর ভিতরের নোংরার ফল। আজকাল এই ডিমকেই ব্যবসায়িক স্বার্থে অহিংসক, নিরামিষ ইত্যাদি নামে প্রচার করে লোকেদের বিভ্রান্ত করা হয়, কিন্তু এটি আদৌ নিরামিষ নয়। শাক-সব্জী উৎপন্ন হয় মাটি, জল-হাওয়া, সূর্য কিরণ আদি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে, কিন্তু ডিম সেভাবে উৎপন্ন হয় না। দুই প্রকার ডিমই মুরগী থেকে উৎপন্ন হয়, এই দুইয়ের Chemical Composition এ কোনো পার্থক্য নেই। যদি পার্থক্য করতেই হয় তবে, এই ডিমকে Immature বা Still Born বলা যেতে পারে, কিন্তু নিরামিষ কখনোই নয়।

এরূপ ডিম বেশি মাত্রায় পাওয়ার ও শীঘ্র অর্থ রোজগারের জন্য মুরগীর ওপর কীরূপ অত্যাচার করা হয়, কী নির্মম উপায়ে মুরগী-পালনকে অতিশয় লাভপ্রদ করার জন্য কীরূপ কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ডিম পাড়ানো হয় এবং সেই ত্রাস সঞ্চারকারী পরিবেশ—যা ডিমের মাধ্যমে উদরে গিয়ে

[১]Medical Basis of Vegetarian Nutrition, New Delhi.

রক্তে মিশে যায়, তা এইপ্রকার—

মুরগী যে ডিম পাড়ে, তা স্বেচ্ছায় বা স্বাভাবিকভাবে নয়, তাকে হরমোন ও Egg Formulation ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়। সেইজন্যই মুরগী ক্রমাগত ডিম পাড়তে থাকে। ডিম পাড়লেই সেটিকে ইন্‌কিউবেটারে রেখে দেওয়া হয় যাতে ২১ দিনের স্থানে ১৮ দিনেই তা থেকে ছানার উদ্‌গম হতে পারে।

মুরগীর বাচ্চা যেইমাত্র ডিম ফুটে বার হয়, তখনই পুরুষ বাচ্চাগুলিকে পৃথক করা হয় এবং স্ত্রীবাচ্ছাগুলিকে শীঘ্র বড়ো করার জন্য বিশেষ প্রকারের আহার দেওয়া হয় এবং তাদের চব্বিশ ঘণ্টা তীব্র আলোয় রেখে ভালোভাবে ঘুমোতেও দেওয়া হয় না, যাতে তারা সারাক্ষণ খেয়ে শীঘ্র রজঃস্রাব করে ডিম দেবার উপযুক্ত হয়। তারপর তাদের খোলামেলা জায়গার পরিবর্তে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয়। খাঁচায় এতো মুরগী একসঙ্গে ভরে দেওয়া হয় যে তারা পাখাও নাড়তে পারে না। স্থানাভাবে সেগুলি নিজেদের মধ্যেই ঠোকাঠুকি করে, আঘাত প্রাপ্ত হয় ও ক্রুদ্ধ হয়। খাঁচায় সেগুলি কষ্টভোগ করতে থাকে। মুরগী তখন ডিম পাড়লে সেটি জাল দিয়ে বাইরে এসে পড়ে আলাদা হয়ে যায়। ডিমে 'তা' দেওয়া হল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে মুরগীকে বঞ্চিত করা হয় যাতে সেটি আবার শীঘ্র ডিম পাড়তে পারে। সারাক্ষণ খাঁচায় বদ্ধ থাকায় তাদের চলা বন্ধ হয়ে যায়। সেই মুরগী যখন ডিম পাড়া বন্ধ করে, তখন তাকে কেটে ফেলা হয়।

এইভাবে পাওয়া ডিম কীভাবে অহিংসক বা নিরামিষ হতে পারে ?

———○———

## (৯) বিভিন্ন ধর্মে আমিষ আহার সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা

বিশ্বের সকল ধর্মে ও শাস্ত্রে মহাপুরুষগণ প্রত্যেক প্রাণীতেই পরম পিতা পরমাত্মারই আভাস দেখতে বলেন এবং অহিংসা পরম ধর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছে। অধিকাংশ ধর্মই আমিষ আহারকে বিশেষভাবে অন্যায় কার্য বলেছেন এবং সেটি ঈশ্বর প্রাপ্তিতে বাধাস্বরূপ, আয়ুহ্রাসকারী এবং পতনের পথে নিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন। সকল ধর্মই নিরীহ প্রাণী হত্যা

করাকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। সম্পূর্ণভাবে অভয়-পদ প্রাপ্তিতেই মুক্তি, পরম-পদ প্রাপ্তি অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তি বলা হয়। এই অভয়পদ প্রাপ্তি তাঁরই হয়, যিনি অপরকে অভয় প্রদান করেন। যিনি নিজের উদর পূর্তির জন্য বা রসনার স্বাদের জন্য কঠিন হৃদয়ে জীবহত্যা করেন অথবা করান, সেই ভয়-প্রদানকারী ও অনিষ্টকারী মানুষ কী করে অভয়পদ লাভ করবেন ? নিজ নিজ স্বাদ এবং ইন্দ্রিয় সুখকেই জীবনের পরম কাম্য মনে করা কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থবশতঃ বলেন যে তাঁদের ধর্মে মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ অসত্য।

**হিন্দুধর্ম**—হিন্দুধর্ম-শাস্ত্র একমতে ঘোষণা করেছে যে, সকল জীবই ঈশ্বরের অংশ এবং অহিংসা, দয়া, প্রেম, ক্ষমা ইত্যাদি গুণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাংসাহার সম্পূর্ণভাবে ত্যাজ্য, দোষযুক্ত, আয়ুক্ষয়কারী ও পাপযোনিতে জন্মদায়ক বলা হয়েছে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে পিতামহ ভীষ্ম মাংস ভক্ষণকারী, মাংস বিক্রয়কারী এবং মাংসের জন্য জীব হত্যাকারী—তিনজনকেই দোষী বলে চিহ্নিত করেছেন।

**ধনেন ক্রয়িকো হন্তি খাদকশ্চেপভোগতঃ।**
**ঘাতকো বধবন্ধাভ্যামিত্যেব ত্রিবিধো বধঃ॥**
**আহর্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।**
**সংস্কর্তা চোপভোক্তা চ খাদকাঃ সর্ব এব তে॥**

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১১৫। ৪০, ৪৯)

'মাংস ক্রয়কারী অর্থের সাহায্যে প্রাণী হিংসা করে, আহারকারী উপভোগ করে হিংসা করে এবং হত্যাকারী বেঁধে রেখে ও হত্যা করে হিংসা করে—এইভাবে তিনপ্রকারে হত্যা হয়। যে ব্যক্তি মাংস আনে, যে অন্যকে দিয়ে আনায়, যে পশুকে কাটে, যে ক্রয় করে, যে বিক্রয় করে, যে রন্ধন করে এবং যে খায়—তারা সকলেই মাংস আহারকারী (হত্যাকারী)।'

তিনি আরও বলেছেন অন্যের মাংসদ্বারা যেসব মানুষ নিজেদের মাংস বৃদ্ধি করে, তারা যেখানেই জন্ম নিক শান্তিতে থাকতে পারে না। যে প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা হয়, পরের জন্মে সেই প্রাণীই তাকে ভক্ষণ করে। বধ কালে সেই প্রাণী বলে **'মাং স ভক্ষয়তে যস্মাদ্ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্'** (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১১৬।৩৫) অর্থাৎ 'আজ ও আমাকে খাচ্ছে,

আমিও কখনো ওকে খাব’।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে আহার তিন প্রকারের—

(১) **সাত্ত্বিক আহার**— যেমন ফল, সব্জী, আনাজ, ডাল, দুধ-মাখন, মেওয়া ইত্যাদি—যা আয়ু-বল-বুদ্ধি বৃদ্ধিকারী এবং সুখ, শান্তি, দয়াভাব, অহিংসা ভাব প্রদান করে ও নানাপ্রকার অশুদ্ধি থেকে শরীর, মন, মস্তিষ্ককে রক্ষা করে।

(২) **রাজসিক আহার**— যা অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কটু, অম্ল, ঝালমশালা দ্বারা জ্বালা উৎপন্নকারী, রুক্ষ পদার্থ যুক্ত। এরূপ খাদ্য উত্তেজক হয় এবং দুঃখ, রোগ, চিন্তাপ্রদানকারী।

(৩) **তামসিক আহার**— বাসী, রসহীন, অর্ধ সিদ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত, পচা, অপবিত্র নেশার পদার্থ ইত্যাদি, যা মানুষকে কুসংস্কারের পথে নিয়ে যায়, বুদ্ধি ভ্রষ্টকারী, রোগ ও আলস্য ইত্যাদি দুর্গুণে গ্রাস করে।

শাস্ত্রে বর্ণিত পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুরাশী লক্ষ যোনি অতিক্রম করার পরই এই মানবজন্ম প্রাপ্তি হয়, সেই দৃষ্টিতে জগতের সকল জীবের সঙ্গে কোন না কোন জন্মে আমাদের কোন না কোন সম্পর্ক থাকে, সুতরাং কোনো জীবের মাংস আহার করার অর্থ নিজেরই কোনো আত্মীয়ের মাংস আহার করা।

অথর্ববেদে (৪।৬।২৩) মাংস ভক্ষণ করা বা গর্ভনাশ করার নিষেধ এইভাবে করা হয়েছে—

**য আমং মাংস মদন্তি পৌরূষেয়ং চ যে করিঃ।**
**গর্ভান্‌ খাদন্তি কেশবাস্তানিতো নাশয়ামসি॥**

অর্থাৎ যে কাঁচা বা রন্ধন করা মাংস খায়, যে গর্ভনাশ করে, এখানে আমি তাদের বিনাশ করি।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থপ্রকাশে বলেছেন যে, মাংসাহার করলে মানুষের স্বভাব হিংস্র হয়ে যায়। যারা মাংসাহার করে বা মদ্যপান করে, তাদের শরীর এবং বীর্য দূষিত হয়।

[১]ইস্‌লাম এর সকল সূফী সাধুগণ স্বচ্ছ জীবন, দয়া, গরীবী এবং

[১]হংসা হীরা মোতী চুগনা, প্রকাশক রাধাস্বামী সৎসঙ্গ, ব্যাস, পাঞ্জাব।

সাধারণ আহার এবং মাংস না খাওয়ার ওপর খুব জোর দিয়েছেন। নিজেরাও মাংস পরিহার আদি অন্যান্য উপদেশ জীবনে পালন করে দেখিয়েছেন। শেখ ইস্‌মাইল, খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী, হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া, বূ আলী কলন্দর, শাহইনায়ৎ, মীর দাদ, শাহ্ অব্দুল করীম প্রমুখ সূফী সাধুদের পথ হল স্বচ্ছভাবে থাকা, আত্মসংযম, শাকাহারী থাকা এবং সকলের প্রতি প্রেম। তাঁদের বক্তব্য হল **'তা বয়াবীঁ দর বহিস্তে অদ্‌ন জা, শক্ষতে বনুমাত্র ব খল্কে খুদা'** অর্থাৎ 'যদি তুমি সর্বদা স্বর্গে বাস করতে চাও তাহলে খোদার সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করো।' ইরানের দার্শনিক আল গুজারীর বক্তব্য হল যে 'রুটির টুকরো ছাড়া আমরা আর যা কিছু খাই, তা শুধু আমাদের বাসনা পূরণের জন্যই খেয়ে থাকি।'

সুপ্রসিদ্ধ সন্ত মীর দাদের বক্তব্য হল যে, যে জীবের মাংস কেটে খাও তার পরিবর্তে তাকে নিজের মাংস কেটে দিতে হবে। যদি কোনো জীবের হাড় ভেঙ্গে দাও তবে তার জন্য নিজের হাড় ভেঙ্গে কষ্ট পাবে। অন্যের রক্তপাত ঘটালে তার জন্য নিজের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে তার হিসাব মেটাতে হবে। কারণ এ এক অটল নিয়ম।

মহাত্মা সরমদ আমিষ আহারের বিরুদ্ধে বলেছেন যে জীবনের সৌন্দর্য বস্তুতে সুপ্ত আছে, বনস্পতি জগতে স্বপ্নাবস্থায় আছে, পশুতে তা জাগ্রত এবং মানুষে তা পূর্ণ চেতনাযুক্ত রয়েছে। কবীর সাহেব মুসলমানদের সম্বোধন করে স্পষ্টই বলেছেন এই 'রোজা' রাখা বৃথা ও নিষ্ফল যদি রসনার স্বাদের বশীভূত হয়ে জীব হত্যা করা হয়। এতে আল্লাহ কখনোও খুশি হন না।

**রোজা ধরৈ মনাবৈ অলহু, সুআদতি জীঅ সংঘারৈ**
**আপা দৈখি অবর নহীঁ দেখৈ কাহে কউ ঝখ মারৈ।**

লণ্ডন মসজিদের ইমাম আল হাফিজ বশীর আহমেদ মসেরী তাঁর পুস্তক 'Islamic Concern about Animals' তে ধর্মের জন্য পশুদের ওপর হওয়া অত্যাচারে দুঃখপ্রকাশ করে পবিত্র কোরান মজীদ এবং হজরত মোহম্মদ সাহেবের কথা উদ্ধৃত করে কোনো জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া, তাদের মানসিক বা শারীরিক ভাবে প্রতারিত করা, এমনকি পাখিদের খাঁচায় বন্দী করাকেও

অন্যায় ও পাপ বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল যে, ইসলাম তো গাছ কাটারও অনুমতি দেয় না। ইমাম সাহেব তাঁর পুস্তকের ১৮ নং পৃষ্ঠায় হজরত মহম্মদের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন 'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দোষ পাখিও হত্যা করে, তবে তাকে খোদার কাছে তার জবাব দিতে হবে আর যে, কোনো প্রাণীর ওপর দয়াপরবশ হয়ে তার প্রাণ রক্ষা করে, তাহলে আল্লাহ তার জীবনের কষ্ট লাঘব করবেন।'

ইমাম সাহেব নিজেও নিরামিষাশী এবং তিনি সকলকে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করারই পরামর্শ দেন।

[১]**খ্রীষ্ট ধর্ম** — জন ব্যাপটিস্ট থেকে যীশুখ্রীষ্ট আত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, যিনি ছিলেন মাংসাহারের ঘোর বিরোধী। যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার দুটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত, 'Thou shall not kill' অর্থাৎ তুমি জীব হত্যা করবে না, এবং Love thy neighbour — নিজের প্রতিবেশীকে ভালোবাসো। Gospel of peace of Jesus Crist-এ যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন 'সত্য এটাই যে, যে হত্যা করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকেই হত্যা করে। যে মৃত পশুর মাংস খায়, সে আসলে নিজেরই মৃত শরীর ভক্ষণ করে। পশুকে হত্যা করা তার নিজেরই মৃত্যুর কারণ হয়, কেননা এই পাপের শাস্তি মৃত্যুর থেকে কম হতে পারে না।' 'মূক প্রাণীর হত্যা কোরো না এবং নিজে নিরীহ পশুর মাংস খেয়ো না, এর ফলে তুমি শয়তানের হাতের পুতুল হয়ে যেও না'। তিনি আরও বলেছেন 'যদি তুমি নিরামিষ খাদ্যে অভ্যস্ত হও তাহলে তুমি জীবন এবং শক্তিলাভ করবে, কিন্তু যদি মাংসাহার করো তাহলে সেই মৃত পশু তোমাকেও বধ করবে।' কারণ শুধুমাত্র জীবনের দ্বারাই জীবন পাওয়া যায়, মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়।

[২]**শিখ ধর্ম**— গুরুবাণী, গুরুমুখীদের জন্য **'অন্ন পানী থোড়া খায়া'** কথাটির আদর্শ রাখে। গুরু অর্জুনদেব পরমাত্মার সত্যকার প্রেমিক ব্যক্তিদের তুলনা হংসের সঙ্গে করেছেন এবং অন্যদের বলেছেন বক। তিনি বলেন হংসের আহার মোতি এবং বকের খাদ্য হল মাছ এবং ব্যাঙ।

---

[১-২]হংসা হীরা মোতী চুগনা, প্রকাশক রাধাস্বামী সৎসঙ্গ, ব্যাস, পাঞ্জাব।

**হংসা হীরামোতি চুগণা, বগু ডডা ভালণ জাবৈ।** (আদি গ্রন্থ, পৃ. ৯৬০)

'গুরুবাণী' গ্রন্থে খুবই স্পষ্ট ভাষায় হিংসার নিষেধ এবং জীবে-দয়ার কথা বলা হয়েছে।

**হিংসা তউ মন তে নহী ছূটী জীএ দইআ নহীঁ পালী।**

(আদি গ্রন্থ, পৃ. ১২৫৩)

কবীর সাহেব অহিংসা ও দয়ার শিক্ষা দিয়েছেন এবং মাংস ভক্ষণের যে নিষেধ করেছেন, তা আদিগ্রন্থে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় অঙ্কিত আছে। গুরু সাহবানো স্পষ্টভাবে হিংসা না করার আদেশ দিয়েছেন এবং হিংসাই যখন নিষিদ্ধ, তখন মাছ-মাংস খাওয়ার প্রশ্নই আসে না। শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি গভীর অনুসন্ধানের পর গুরু সাহেবের যে নির্দেশ ও হুকুমনামা পুস্তকরূপে প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে একটি নির্দেশ এইরূপ—

(পৃষ্ঠা ১০৩)

হুকুমনামা নং ১১৩

হুকুমনামা বাবা বন্দা বাহাদুরজী

মোহর ফারসী

দেগো তেগো ফতহি নুসরত বেদরিগ

যাফত অজ নানক গুরু গোবিন্দ সিংহ

১ ওা ফতে দরসনু

**সিরী সচে সাহিব জী দা হুকম হৈ সরবত খালসা জউনপুর কা গুরু রহেগা......খালসে দী রহত রহণা মগ্ন তম্বাকু হফীম পোস্ত দারু কোই নাহি খাণা মাস মছলী পিআজ না হী খাণা চোরী জারী নাহী করণী।**

অর্থাৎ মাছ-মাংস, পিঁয়াজ, নেশার বস্তু, মদ ইত্যাদির সেবন বারণ করা হয়েছে। সমস্ত গুরুদ্বারের লঙ্গরে অনিবার্যভাবে শাকাহারই প্রস্তুত করা হয়।

(১)**জৈন ধর্ম**—জৈনধর্মের মুখ্য সিদ্ধান্তই হল অহিংসা। জৈন গ্রন্থে হিংসার ১০৮টি পার্থক্য করা হয়েছে। ভাব হিংসা, কর্ম হিংসা, নিজে হিংসা করা, অন্যের দ্বারা করানো অথবা হিংসার অনুমোদন, সবই বর্জিত।

(১)হংসা হীরা মোতী চুগনা—প্রকাশক রাধাস্বামী সৎসঙ্গ, ব্যাস, পাঞ্জাব।

হিংসাবিষয়ক চিন্তা করাকেও পাপ বলা হয়েছে। মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা হিংসা করা হয়, সুতরাং কাউকে এমন কথা বলা, যা তাকে পীড়িত করে, তা-ও হিংসা বলে মনে করা হয়। পশুকে বেঁধে রাখা, দুঃখ দেওয়া, মারা বা অত্যধিক ভার বহন করানোকেও যে জৈন ধর্মে পাপ বলা হয়েছে, সেখানে মাংস ভক্ষণের তো প্রশ্নই ওঠে না।

[১]**বৌদ্ধ ধর্ম**—বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চশীল অর্থাৎ সদাচারের পাঁচটি নিয়মের প্রথম এবং প্রধান নিয়ম হল কোনো প্রাণীকে দুঃখ না দেওয়া, এটি প্রকৃত অর্থে অহিংসাই ঘোষণা করে এবং পঞ্চম নিয়ম হল, মদ ইত্যাদি নেশার পদার্থ ত্যাগ করার শিক্ষা। লঙ্কাবতারের সূত্রের অষ্টম কাণ্ড অনুসারে মানা হয়েছে যে, অনন্তকাল ধরে গমনাগমনকারী জীব কোনো না কোনো জন্মে, কোনো না কোনোরূপে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এতে প্রত্যেক প্রাণীকে নিজসন্তানের মতো ভালোবাসার নির্দেশ দেওয়া আছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির আপতকালেও মাংস খাওয়া উচিত নয় বলা হয়েছে এবং সেই আহারই সঠিক বলা হয়েছে, যাতে মাংস বা রক্তের অংশ না থাকে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক ধর্মে সমস্ত জীবেই ভগবানের বাস মনে করা হয় এবং সেখানে অহিংসা, দয়া ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

———○———

## (১০) জগতের মহাপুরুষগণ কর্তৃক আমিষ আহারের নিন্দা

বিশ্বের ইতিহাসে দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে জগতের সমস্ত বিখ্যাত মহাপুরুষ, চিন্তাশীল ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, লেখক, যেমন পিথাগোরাস, প্লুটার্ক, স্যার আইজাক নিউটন, মহান চিত্রকর লিওনার্ডো দ্যা ভিঞ্চি, ডাঃ এ্যানি বেসান্ত, এ্যালবার্ট আইনষ্টাইন, রেভারেণ্ড ডা. ওয়াল্টার ওয়ালহ্, জর্জ বার্নার্ড, শ টলস্টয়, কবি মিল্টন, পোপ, শেলী, সক্রেটিস এবং গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল্—এঁরা সকলেই নিরামিষাশী

[১]হংসা হীরা মোতী চুগনা, প্রকাশক ঃ রাধাস্বামী সৎসঙ্গ, ব্যাস, পাঞ্জাব।

ছিলেন। শাকাহারের জন্যই তাঁরা সহিষ্ণুতা, দয়া, অহিংসা ইত্যাদি সদ্‌গুণ দ্বারা বিভূষিত হয়েছিলেন।

মহান বৈজ্ঞানিক এ্যালবার্ট আইনষ্টাইন বলেছেন যে 'নিরামিষ আহারের দ্বারা প্রকৃতির ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। জগৎ যদি নিরামিষ ভোজী হয় তাহলে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে'। জল-চিকিৎসার আবিষ্কারক সুপ্রসিদ্ধ স্যার লুইকুও বলেছেন যে, মানুষ আমিষাশী প্রাণী নয়। তারা মাংসভক্ষণ করে প্রকৃতির বিরুদ্ধ কর্ম করে নানা প্রকার বিপদ ডেকে আনে। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি খাঁচায় বন্দী পাখি কিনে, তাদের উড়িয়ে দিতেন। তিনি বলতেন যে, মানুষ যদি স্বাধীনতা চায়, তাহলে পশু-পাখিদের কেন বন্দী করে ?

সেন্ট ম্যাথু, সেন্ট পল মাংসাহারকে ধার্মিক পতনের সূচক বলে মনে করতেন। মেথোডিষ্ট এবং সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট আমিষ আহার ও মদ্যপানের কঠোর নিষেধ করেছেন। টলস্টয় এবং রুশ-এর খ্রীষ্টান মোমিনও আমিষ আহার করা খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধ বলে জানিয়েছেন।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের শিষ্য রোমান কবি সেনেকা নিরামিষাশী হয়ে অত্যন্ত সুখপ্রদ আশ্চর্য অনুভূতি লাভ করেছিলেন যে, তাঁর মন পূর্বের থেকে বেশি সুস্থ, সচেতন ও সমর্থ হয়ে গিয়েছিল।

জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর এক কবিতায় লিখেছিলেন যে, 'আমরা মাংস ভক্ষণকারীরা হলাম এক একটি জীবন্ত কবর, যার মধ্যে জানোয়ারদের মৃতদেহ পোরা আছে—আমাদের স্বাদের জন্য যাদের বধ করা হয়েছে।'

ডাক্তারেরা বার্ণার্ড শ কে বলেছিলেন 'মাংস না খেলে আপনি মরে যাবেন।' তার উত্তরে বার্ণার্ড শ বলেছিলেন 'মাংস খাওয়ার থেকে মৃত্যু শ্রেয়'। তিনি ডাক্তারদের বলেছিলেন 'আমি যদি বেঁচে যাই, তাহলে আশা করব আপনারাও নিরামিষাশী হবেন'। বার্ণার্ড শ তো বেঁচে গেলেন, কিন্তু ডাক্তারেরা নিরামিষাশী হলেন না। এই মহান ব্যক্তি সঙ্গী-জীবদের খাওয়ার পরিবর্তে মৃত্যুও শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন।

এরূপ মহাত্মা গান্ধীর সন্তানের যখন কঠিন অসুখ হয় তখন ডাক্তারেরা তাঁকে বলেছিলেন, শিশুকে মাংসের সূপ না দিলে সে বাঁচবে না। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, পরিণাম যা-ই হোক না কেন, মাংসের সূপ দেওয়া যাবে

না। শিশুটি মাংসের সূপ না খেয়েই বেঁচে গিয়েছিল।

চাণক্য নীতিতে বলা হয়েছে যে, যে মাংস খায়, মদ্যপান করে সেই পুরুষরূপী পশুদের ভারে পৃথিবী দুঃখ পেয়ে থাকে।

মহর্ষি রমণ অহিংসাকে সর্বপ্রথম ধর্ম বলে জানিয়েছেন এবং সাত্ত্বিক আহার যেমন ফল, দুধ, শাক-সব্জী ইত্যাদি একটি নিশ্চিত মাত্রায় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতীয় ঋষি-মুনি কপিল, ব্যাস, পাণিনি, পতঞ্জলি, শংকরাচার্য, আর্যভট্ট আদি সকল মহাপুরুষ, ইসলামের সব সূফী সন্ত এবং **'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'** প্রচারক মহাত্মা বুদ্ধ, ভগবান মহাবীর, গুরুনানক, মহাত্মা গান্ধী সকলেই শুদ্ধ নিরামিষ আহারী ছিলেন এবং এঁরা সকলেই আমিষ আহারের বিরোধিতা করেছেন। কারণ শুদ্ধ বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতা আমিষ আহারের দ্বারা সম্ভব নয়।

[১]মহাত্মা গান্ধী এমন কথাও বলেছেন যে, 'আমার বিচারানুসারে গো-রক্ষার প্রশ্ন স্বরাজ্যের প্রশ্ন থেকে ছোট নয়। কয়েকটি বিষয়ে আমি সেটি স্বরাজ্যের প্রশ্ন থেকেও বড়ো মনে করি। আমার কাছে গো-হত্যা এবং মানুষ-হত্যা একই মনে হয় ।'

প্রসিদ্ধ কবি Coleridge তাঁর কবিতায় (The Ancient Mariner) বলেছেন সেটি হল সকল ধর্মের সারকথা।

He prayeth best, who loveth best
All things both great and small,
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all.

ভাবার্থ—যিনি এই জগতের ছোটো-বড়ো সকল প্রাণীর তথা সকল বস্তুর প্রতি অসীম ভালোবাসা পোষণ করেন, তিনিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক ; কারণ, সেই পরমেশ্বর—যিনি আমাদের পরম প্রিয় এবং আমাদের সবাইকে যিনি একান্তভাবে ভালোবাসেন তিনিই এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এই সমস্ত কিছুতেই তাঁর প্রেম সমানভাবে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

---

[১]শাকাহার ক্রান্তি, May 90

## (১১) আমিষ আহারের দ্বারা ঈশ্বরের অপ্রসন্নতা লাভ হয়

য ইচ্ছেৎ পুরুষোঽত্যন্তমাত্মানং নিরুপদ্রবম্।
স বর্জয়েৎ মাংসানি প্রাণিনামিহ সর্বশঃ॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ১১৫।৪৮)

'যে ব্যক্তি আত্যন্তিক শান্তি লাভ করতে চান, জগতে তাঁর কোনো প্রাণীর মাংস কোনো উপলক্ষ্যেই খাওয়া উচিত নয়।'

সমগ্র চরাচর জগৎস্রষ্টা পরম পিতা পরমাত্মার দৃষ্টিতে সকল জীব সমান, অর্থাৎ তাঁর বলার তাৎপর্য হল, তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় সকলেই তাঁর সন্তান। তাই ভক্তদের দৃষ্টিতে সকলজীবই ভ্রাতৃতুল্য, এই রহস্য জানা ঈশ্বর-ভক্তের পক্ষে পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান, নিজের বন্ধুসদৃশ কোনো প্রাণীকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র কষ্টও দিতে পারেন না। যাঁরা একথা না জেনে স্বার্থবশতঃ অন্য জীবকে হত্যা করেন এবং হত্যা করেও নিজে ভগবানের দয়া ভিক্ষা করেন ও ঈশ্বর-প্রাপ্তি কামনা করেন, তাঁরা অত্যন্ত ভুল করেন। প্রাণীবধকারী ক্রূর মানুষের ওপর ঈশ্বর কীভাবে প্রসন্ন হতে পারেন ? কোনো পিতার একজন পুত্র যখন লোভের বশে তার আর এক নির্দোষ ভাইকে কষ্ট দেয় বা হত্যা করে, তাতে পিতা যেমন ক্রুদ্ধ হন, তেমনই প্রাণীদের কষ্টদানকারী লোকও ঈশ্বরের অপ্রসন্নতা ও কোপভাজন হন।

———○———
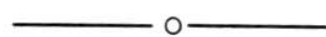
## (১২) আমিষ আহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পতনের কারণ

মানুষের চিন্তাই তার কর্মকে প্রভাবিত করে। যার মধ্যে অহিংসা, দয়া, পরোপকার ইত্যাদির চিন্তা থাকে, সে এমন কর্ম করবে না বা করাতে চাইবে না যাতে অন্য প্রাণী কষ্ট পায়। যার হৃদয় কোনো প্রাণীকে দুঃখ-কষ্টে দেখে দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ চিন্তাযুক্ত মানুষ মাংস ভক্ষণের কথা চিন্তাই করতে পারে না। কিন্তু যার চিন্তা এর বিপরীত, যে হিংসা করতে, ক্রূরতা করতে,

নিজ স্বার্থের জন্য অন্যকে কষ্ট দিতে দ্বিধাবোধ করে না, তার কাছে মাংসাহার কেন, কোনো অনৈতিক কাজ করতেই সে পিছপা হয় না। যার মন পশুর বুকে ছুরি চালানোতে আহত হয় না, সে মানুষের ওপর গুলি বর্ষণ করতে কেন ভয় পাবে ? যে নিজের স্বাদ এবং শরীরের পুষ্টির জন্য প্রাণীকে বধ করে তার মাংস খায়, সে তার অন্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য—ব্যবসা, পদ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির লোভে যে কোনো হিংসা করতে বা করাতে পিছুপা হবে কেন ? এরূপ স্বার্থপর ব্যক্তি থেকে কি কখনও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের আশা করা যায় ?

মাংসাহারী মানুষ নির্দয় হয়ে যায় আর যার দয়া নেই তার ধর্মহীন হওয়াতে কোনো সন্দেহই থাকে না। মাংসাহারী ব্যক্তি ভুলে যায় যে, 'মাংস ভক্ষণ করে কতো বড়ো নির্দয় কাজ করছি। আমার তো কিছু সময়ের জন্য রসনার তৃপ্তি, ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে ; কিন্তু বেচারী পশু বা পক্ষীর প্রাণ চিরকালের মতে চলে যাচ্ছে।' প্রাণনাশের মতো দুঃখ আর কী আছে ? জগতে সকল প্রাণীই প্রাণনাশের ভয় পায়।

**অনিষ্টং সর্বভূতানাং মরণং নাম ভারত।**
**মৃত্যুকালে হি ভূতানাং সদ্যো জায়তে বেপথুঃ॥**

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ১১৬।২৭)

'হে ভারত ! মৃত্যু সকল জীবের পক্ষেই অনিষ্টকর, মরণের সময় সকল জীবই সহসা কম্পিত হয়।'

মাংসাহার দ্বারা মস্তিষ্কের সহ্যশীলতা এবং স্থৈর্য হ্রাস হয়, বাসনা এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, ক্রূরতা ও নির্দয়ভাব জন্ম নেয়। কোনো বালককে যখন প্রথম থেকেই মাংসাহারে অভ্যস্ত করানো হয়, তখন সে স্বার্থের জন্য অন্য জীবের মাংস খাওয়া, তাকে কষ্ট দেওয়া, মারা ইত্যাদি কাজ এতো সহজে করে যে কাউকে হত্যা করতে, হিংসার কাজ করতে তার কোনো অপরাধ বোধ আসে না। অহিংসা, দয়া, পরোপকারের চিন্তা তার মাথায় আসে না। তার মধ্যে শুধু স্বার্থের চিন্তাই বেড়ে ওঠে, যা তাকে নিজের তুচ্ছ স্বার্থের জন্য জাতি, দেশেরও ক্ষতি করতে বাধা দেয় না।

আধুনিক বিশ্বে হিংসা, ঘৃণা, দুষ্কর্ম বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হল মাংসাহারের ফলে কোমল সৎচিন্তার বিনাশ এবং স্বার্থপরতা আদির বৃদ্ধি।

আমিষ খাদ্য বাসনাসমূহকে উত্তেজিত করে এবং তা যতো ভোগ করা হয় ততোই আরও বেড়ে ওঠে, কখনোই তার তৃপ্তি হয় না। বাসনার পথে কোনো বাধা এলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধের ফলে ভালো-মন্দের বিচার নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তাতে পথভ্রষ্ট হয় অথবা সর্বনাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ মাংসাহার সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

এই পুস্তকে আগে বলা হয়েছে যে অপরাধীদের মধ্যে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, 75 % অপরাধী মাংসাহারী, শুধু 25 % শাকাহারী। অর্থাৎ মাংসাহার দ্বারা অপরাধের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, আমিষ আহারে অন্যান্য ক্ষতি ছাড়াও বিশ্বে হিংসা, অমানবিকতা, দুষ্কর্ম ইত্যাদি বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ এবং এটি মানুষকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়। আমাদের কর্তব্য হল একে রোধ করা। আমরা যদি তা করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মকে এর ভয়ানক ফল ভুগতে হবে।

প্রায়শঃ দেখা যায় যে দুষ্কর্ম, ধর্ষণ, নির্দয়ভাবে হত্যা ইত্যাদি করে যেসব দুর্বৃত্ত, তারা সাধারণ অবস্থায় এই কাজ করে না। এই সব কাজের আগে তারা মদ্যপান ও মাংসাহার করে, তাতে তাদের বিবেক, মানবিকবোধ, নৈতিকতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে এই দুষ্কর্ম করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন কেউ এই অন্যায় কাজ করতে মন থেকে তৈরি থাকে না, তখন তার অন্তরের কথা অগ্রাহ্য করার জন্য এইসব পদার্থের উপভোগ করে। দুর্ভাগ্যের কথা যে, আজকাল লোকেরা ফ্যাসান, আধুনিকতা কিংবা নিজেদের আধুনিক দেখানোর জন্য আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে এবং এটি সর্বজনবিদিত যে আজকে মানুষের নৈতিক স্তরের মানদণ্ড কোথায় নেমেছে ! নিজের নিজের অন্তর্মনই এটি ভালো করে জানে।

কিছু নিরামিষাশী ব্যক্তি আধুনিক হওয়ার জন্য নিরামিষ পদার্থ দ্বারা পশু-পক্ষীর আকৃতির খাদ্য তৈরি করে মাংসাহারীদের মতো ভোজন করেন, যেন তাঁরাও মাংসাহারী। এরূপ আহার যদিও স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়, কিন্তু চিন্তার দিক থেকে এটি অনুচিত। কারণ চিন্তাই আমাদের তদনুরূপ কর্মের পথে প্রেরণ করে। এরূপভাবে নিরামিষ আহার করলেও মনে তো এই চিন্তারই উদয় হয় যে আমরা প্রাণী বধ করে আনন্দে তা আহার করছি।

এই চিন্তাই আমাদের অহিংসা, দয়া, প্রেমের মতো গুণ থেকে অপসারিত করে ক্রমে হিংসা, ক্রূরতা ইত্যাদির দিকে প্রেরণ করে এবং অবশেষে যা আমাদের বা আমাদের বংশধরদের আমিষাশী করে তুলবে।

———o———

## (১৩) আমিষ খাওয়া মহাপাপ

ধর্মে সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে অহিংসাকে, অন্যান্য দয়া, সংযম আদি সব ধর্মেরই অঙ্গ, কিন্তু অহিংসা পরম ধর্ম—**'অহিংসা পরমো ধর্মঃ।'** (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১১৫।২৫)। ধর্মের তাৎপর্য অহিংসাতে। ধর্মমান্যকারী সকল ব্যক্তিই অহিংসা ও ত্যাগের প্রশংসা করেন। যে ধর্ম মানুষের মনোবৃত্তিকে অহিংসা, ত্যাগ, নিবৃত্তি ও সংযমের দিকে নিয়ে যায়, সেটিই হল প্রকৃত ধর্ম। যে ধর্মে এই সকল গুণের অভাব থাকে, সেই ধর্ম পূর্ণ নয়, মাংস-ভক্ষণকারীরা অহিংসা-ধর্ম হনন করেন, ধর্ম-হননই পাপ। কেউ যদি বলেন যে 'আমি তো নিজে পশুকে মারি না বা হত্যা করাই না, অন্যের দ্বারা বধ করা পশু-পক্ষীর মাংস ক্রয় করে খাই, তাহলে আমি কেন প্রাণী-হত্যার পাতক হব ?' এর উত্তর স্পষ্ট। মাংসাহারীদের জন্যই প্রাণী হিংসা করা হয়। কসাইখানা মাংসহারীদের জন্যই নির্মিত হয়েছে। মাংসাহারীরা যদি মাংসাহার ত্যাগ করেন তাহলে প্রাণীবধ করা হবে কেন ? আর এই কথাও বুঝতে হবে যে কেবল নিজ হাতে হত্যা করলেই ঘাতক হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি অহিংসার প্রধানতঃ সাতাশটি ভাগের কথা বলেছেন—

যথা—**'বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহ-পূর্বকা মৃদমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।'** (যোগদর্শন ২।৩৪) অর্থাৎ হিংসা তিন প্রকারের—নিজে হিংসা করা, অপরের দ্বারা করানো এবং হিংসা সমর্থন করা। এই তিন প্রকারের হিংসা লোভ, ক্রোধ ও অজ্ঞানবশতঃ হওয়ায় (৩ x ৩ = ৯) নয় প্রকারের হয়ে ওঠে এবং এই নয় প্রকারের হিংসা মৃদু, মধ্য এবং অধিকমাত্রা হওয়ায় (৯ x ৩ = ২৭) সাতাশ প্রকারের হয়ে ওঠে। এইভাবে মিথ্যা ভাষণ ইত্যাদির

পার্থক্যও বুঝতে হবে। এই প্রকারের হিংসার ফলস্বরূপ জীবন কখনও দুঃখ ও অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয় না— এমন চিন্তা করাকেই বলা হয় প্রতিপক্ষ ভাবনা। এই ২৭ প্রকারের হিংসা শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা হওয়ায় একাশি পার্থক্য বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। তাই নিজে হত্যা না করেও অপরের দ্বারা প্রাণী হত্যার দ্বারা যে মাংস ভক্ষণ করা হয়, সেও প্রকৃতপক্ষে প্রাণীঘাতকই হয়।

**অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।**
**সংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥**

(মনুস্মৃতি ৫।৫১)

'পরামর্শ-দানকারী, অঙ্গ ছেদনকারী, হত্যাকারী, মাংস-বিক্রয়কারী, মাংস-ক্রয়কারী, রন্ধনকারী, পরিবেশনকারী এবং আহারকারী— এদের সবাইকেই ঘাতক বলা হয়।'

সুতরাং মাংস-ভক্ষণ ধর্ম হননকারী হওয়ায় সর্বতোভাবে মহাপাপ। ধর্ম-পালনকারীদের জন্য হিংসা ত্যাগ প্রথম সোপান। যার হৃদয়ে অহিংসাভাব নেই, সেখানে ধর্মের স্থান কোথায় ?

———০———

## (১৪) মাংস-ভক্ষণ শাস্ত্রনিন্দিত

যদিও শাস্ত্রে কোথাও কোথাও মাংসের কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু সেখানেও মাংসত্যাগের বিষয়ে অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলা হয়েছে। প্রায় সকল শাস্ত্রেই মাংসাহারের নিন্দা করে মাংস ত্যাগকেই অতি উত্তম বলে জানানো হয়েছে। এমন হাজার হাজার উক্তি আছে, তার মধ্যে কিছু নীচে দেওয়া হল—

**যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।**
**স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥**
**সমুৎপত্তিং চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।**
**প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥**

(মনুস্মৃতি ৫। ৪৫, ৪৯)

'যে ব্যক্তি নিরপরাধ জীবেদের নিজের সুখের জন্য হিংসা করে, সে জীবিত থেকে অথবা মৃত্যুর পরেও (ইহলোক বা পরলোকে) কখনও সুখ পায় না। পশুপক্ষীর দেহ থেকে মাংস কাটার সময়ে প্রাণীদের প্রতি হিংসা এবং তাদের বেঁধে রাখার দুঃখ-কষ্ট দেখে মানুষের সর্বপ্রকার মাংসাহার ত্যাগ করা উচিত।'

যমস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

**সর্বেষামেব মাংসানাং মহান্ দোষস্তু ভক্ষণে।**
**নিবর্তনে মহৎ পুণ্যমিতি প্রাহ প্রজাপতিঃ॥**

'প্রজাপতির বক্তব্য হল যে, যে কোনও প্রকারের মাংস ভক্ষণ করা মহা দোষ এবং তার থেকে রক্ষা পাওয়া মহা পুণ্য।'

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বলা হয়েছে—

**লোভাদ্বা বুদ্ধিমোহাদ্বা বলবীর্যার্থমেব চ।**
**সংসর্গাদথ পাপানামধর্মরুচিতা নৃণাম্॥**
**স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।**
**উদ্বিগ্নবাসো বসতি যত্র যত্রাভিজায়তে॥**
**ইজ্যাযজ্ঞশ্রুতিকৃতৈর্যো মার্গৈরবুধোঽধমঃ।**
**হন্যাজ্জন্তূন্ মাংসগৃধ্নুঃ স বৈ নরকভাঙ্‌নরঃ॥**

(১১৫।৩৫-৩৬, ৪৭)

**স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।**
**নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎস নৃশংসতরো নরঃ॥**

(১১৬।৭)

**শুক্রাচ্চ তাত সম্ভূতির্মাংসস্যেহ ন সংশয়ঃ।**
**ভক্ষণে তু মহান্ দোষো নিবৃত্ত্যা পুণ্যমুচ্যতে॥**

(১১৬।৯)

'লোভে কিংবা বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হলে অথবা পাপীদের সংসর্গ করলে বল ও পরাক্রম লাভের জন্য মানুষের (হিংসারূপ) অধর্মে রুচি হয়।'

'যে ব্যক্তি নিজের মাংস অন্যের মাংস দ্বারা বাড়াতে চায়, সে যে কোনো জন্মই প্রাপ্ত হোক না কেন, সেখানে দুঃখী হয়ে জীবন-যাপন করে।'

'যে অজ্ঞ এবং অধম ব্যক্তি দেবপূজা, যজ্ঞ ও বেদোক্ত পথের আশ্রয় নিয়ে মাংসের লোভে জীবহিংসা করে, সে নরক প্রাপ্ত হয়।'

'যে ব্যক্তি অন্যের মাংসের দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, তার থেকে বেশি অধম আর কেউ নেই, সে অত্যন্ত নির্দয়।'

'হে তাত ! বীর্য থেকে মাংসের উৎপত্তি হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই (তাই এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু)। এটি ভক্ষণ করলে মহাদোষ এবং এটি ত্যাগের দ্বারা পুণ্য লাভ হয়।

———০———

## (১৫) আমিষ আহার না করার সুফল

**বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।**
**মাংসানি চ ন খাদ্যেস্তয়ো পুণ্যফলং সমম্॥**

(মনুস্মৃতি ৫।৫৩)

'যিনি শত বর্ষ ধরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যিনি কোনোপ্রকার মাংস ভক্ষণ করেন না—এই দুজন একই প্রকার পুণ্য লাভ করেন।'

**শরণ্যঃ সর্বভূতানাং বিশ্বাস্যঃ সর্বজন্তুষু।**
**অনুদ্বেগকরো লোকে ন চাপ্যুদ্বিজতে সদা॥**
**অধৃষ্যঃ সর্বভূতানামায়ুষ্মান্নীরুজঃ সদা।**
**ভবত্যভক্ষয়ন্ মাংসং দয়াবান্ প্রাণিনামিহ॥**
**হিরণ্যদানৈর্গোদানৈর্ভূমিদানৈশ্চ সর্বশঃ।**
**মাংসস্যাভক্ষণে ধর্মো বিশিষ্ট ইতি নঃ শ্রুতিঃ॥**

( মহাভারত অনুশাসনপর্ব, ১১৫।৪২-৪৩)

'মাংসাহার না করা এবং প্রাণীদের প্রতি সর্বদা দয়াশীল ব্যক্তি, সমস্ত জীবেদের আশ্রয়স্থান এবং বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠেন ; তাঁর জন্য কারো উদ্বেগ হয় না এবং তিনিও কারো উদ্বেগের পাত্র হন না। তাঁকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না, তিনি দীর্ঘায়ু হন এবং সর্বদা নীরোগ থাকেন। মাংস আহার না করলে যে পুণ্য হয়, তার সমান স্বর্ণদানেও হয় না, গোদানেও হয়

না এবং ভূমিদানেও হয় না।'

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মাংসাহার সর্বপ্রকারে ত্যজনীয়। আমার নম্র নিবেদন যে, যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ মাংসভক্ষণ করেন, তিনি ভালোভাবে চিন্তা করে, মনুষ্যত্বের জন্য, দয়া ও ন্যায়ের জন্য, শরীর-স্বাস্থ্য ও ধর্মরক্ষার জন্য, ভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য ইন্দ্রিয় সংযম করে মাংস-ভক্ষণ চিরকালের জন্য যেন ত্যাগ করেন। তিনি সব জীবকে অভয় প্রদান করে নিজেও অভয় পদ প্রাপ্ত করার যোগ্যতা যেন অর্জন করেন। যে ব্যক্তি আমার প্রার্থনায় গুরুত্ব দিয়ে মাংস-ভক্ষণ ত্যাগ করবেন, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং জানব তিনি আমাকে অত্যন্ত দয়া করেছেন।

মহাত্মা তুলাধার জাজলিমুনিকে বলেছেন—

**যস্মান্নোদ্বিজতে ভূতং জাতু কিঞ্চিৎ কথঞ্চন।**
**অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ স প্রাপ্নোতি সদা মুনে॥**
**যস্মাদুদ্বিজতে বিদ্বন্ সর্বলোকো বৃকাদিব।**
**ক্রোশতস্তীরমাসাদ্য যথা সর্বে জলেচরাঃ॥**
**তপোভির্যজ্ঞদানৈশ্চ বাক্যৈঃ প্রজ্ঞাশ্রিতৈস্তথা।**
**প্রাপ্নোত্যভয়দানস্য যদ্যৎ ফলমিহাশ্নুতে॥**
**লোকে যঃ সর্বভূতেভ্যো দদাত্যভয়দক্ষিণাম্।**
**স সর্বযজ্ঞৈরীজানঃ প্রাপ্নোত্যভয়দক্ষিণাম্।**
**ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্মোঽস্তি কশ্চন॥**

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৬২।২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০)

'হে মুনিবর ! যে ব্যক্তির দ্বারা কোনো প্রাণী কোনোরূপ কষ্ট না পায়, সেই ব্যক্তিরও কোনো প্রাণী থেকে কোনোপ্রকার ভয় থাকে না। যেরূপ দাবাগ্নিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত জলচর প্রাণী সমুদ্রতীরে একত্রিত হয়, তেমনই হে বিদ্বদ্‌বর ! যে ব্যক্তিকে সকলে ভয় পায়, সে নিজেও ভীত হয়ে থাকে।'

'নানা প্রকার তপস্যা, যজ্ঞ ও দান এবং প্রজ্ঞাযুক্ত উপদেশে যে ফল লাভ হয়, জীবকে অভয়দান করলে সেই ফলই লাভ করা যায়।'

'যে ব্যক্তি এই জগতে সকল প্রাণীকে অভয়দান করে ; তার সমস্ত

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়ে যায় এবং পরিবর্তে সে সকলের থেকে অভয় প্রাপ্ত হয়, অতএব প্রাণীদের কষ্ট না দেওয়ার থেকে বড়ো আর কোনো ধর্মই নেই।’

---

## (১৬) ন্যায়-পথে উপার্জনের গুরুত্ব

মানুষের আহার কেমন এবং কী হবে তার সঙ্গে এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যে অর্থের দ্বারা আহার সংগ্রহ করা হয়, সেই অর্থ কীভাবে অর্জিত হয়েছে। মহাপুরুষদের বক্তব্য হল ‘উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাপ্তির সাধনও উত্তম হওয়া চাই’। উত্তম সাধন দ্বারা অর্জিত ধনে প্রাপ্ত আহার উত্তম চিন্তার জন্ম দেয়। অন্যকে কষ্ট দিয়ে প্রাপ্ত ধন দ্বারা সংগৃহীত অন্ন দুঃখই দিয়ে থাকে। সেই আহার কল্যাণকারী না হয়ে অমঙ্গলকারী এবং কুকর্মে প্রেরণকারী হয়। সুতরাং আহারের সঙ্গে কাজও শুদ্ধ হওয়া চাই। উচিত রীতিতে অর্জিত অর্থ অধিক স্থায়ী হয়, সুপথে নিয়ে যায় এবং সুখপ্রদ হয়। হিংসা, ছল, মিথ্যাচার দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ অস্থায়ী, দুর্ব্যসনে-দুষ্কার্যে নষ্ট হয় এবং দুঃখদায়ক হয়। ধন যে পথে আসে, তেমন পথেই চলে যায়। ডাকাত, চোরাকারবারী, মন্দ ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা নেশার পদার্থ ও অন্যান্য দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। আমরা যদি চারপাশে দেখি, তাহলে প্রত্যক্ষ করতে পারি যে, যে পরিবার বদ্ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, তাদের সেই অর্থ টেকে না। তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চরিত্রহীনতা, নেশা, অসুখ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদির আধিক্য দেখা যায়, যার ফলে তাদের সন্তোষ ও শান্তি থাকে না।

নিজের কার্যে ধন তো বেশ্যাও উপার্জন করে, কিন্তু কজন ব্যক্তি তার কাছে খেতে চায় ? ভোজন প্রস্তুত করার পদার্থ তো তারও একই রকম, যা কোনও ধার্মিক স্থলে বানানো ভোজনে হয়ে থাকে। কিন্তু ধার্মিক জায়গায় তৈরি আহারকে প্রসাদ মনে করা হয়, কারণ সেই আহার যে অর্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে, তা অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং উত্তম চিন্তা দ্বারা সংগৃহীত, কোনো বাসনা পূরণ বা অন্যায় দ্বারা প্রাপ্ত ধনে নয়।

সুতরাং সাত্ত্বিক আহারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থ উপার্জনও শুদ্ধভাবে হওয়া উচিত। জীব-হিংসা করে বা হিংসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে প্রাপ্ত আহার কখনও সুখ, শান্তি, আরোগ্য প্রদান করে না। সুতরাং নিম্ন লিখিত কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধনকে শুদ্ধ মনে করা হয় না।

(ক) মাংসাহারী ব্যক্তির জন্য পশু-পক্ষী বধ করা বা করানো।

(খ) মজা করার জন্য পশু, মুরগী, বলদ ইত্যাদিকে পরস্পরের মধ্যে মৃত্যুক্ষয়ী ঝগড়ায় লেলিয়ে দেওয়া।

(গ) চর্বি, ফার বা কীট দ্বারা প্রস্তুত রেশম বস্ত্র, তেল, পাখিদের পাখা থেকে তৈরী বস্তু—যার জন্য জীবিত প্রাণী হত্যা করা হয়।

(ঘ) পাখি ধরে বন্দী করে রাখা এবং তা বিক্রী করে অর্থ রোজগার করা।

(ঙ) নেশার বস্তু নিয়ে কারবার করা বা করানো।

(চ) মাংসের জন্য জীবহত্যাকারী বা হত্যার প্ররোচনাদানকারীও মাংস আহারকারীর মতো সমানভাবে দোষী হয়।

———○———

# (১৭) একটি প্রাণীর আত্মকথা

অন্য সব জীবের মতো নানা জন্ম পরিভ্রমণের পর আমি যখন ছাগল-মায়ের গর্ভে আসি এবং পাঁচমাস গর্ভ-দুঃখ সহ্য করার পর আমার যখন জন্ম হয়, তখন একবার আমার এই পৃথিবী অত্যন্ত প্রিয় মনে হয়। মানুষ এবং তাদের ছোট বাচ্চারা আমাকে খুব আদর করতো, কোলে নিত, সবুজ পাতা খেতে দিত। আমার ছাগল-মায়ের দুধ খেয়ে আমি বড়ো হতে থাকলাম। আমার মায়ের মালিকও আমাকে ভালোবাসতেন, তিনি আমাকে তাঁর খেত-খামারে নিয়ে যেতেন, সেখানে আমি নিজে নিজে সবুজ পাতা খেতাম। খেত-খামারে আমি নোংরা করলে বা হুটোপাটি করলেও মালিক কখনও রাগ করতেন না। মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানাতেন

আমাদের মলে সার তৈরী হয় এবং তাতে জমি আরও উর্বর হয়ে অধিক ফসল ফলে, তাই মালিক এতে রুষ্ট হন না।

ধীরে ধীরে সময় পার হতে লাগল আর আমিও সঙ্গীদের সঙ্গে আনন্দে জীবন কাটাতে লাগলাম। আমি যখন দেড় বছরের, সেই সময় এক নতুন ব্যক্তি আমার মালিকের কাছে আসেন। তাঁর সঙ্গে মালিকের কিছু কথা-বার্তা হয় এবং মালিক আমাকে ও সেই সঙ্গে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ আমার সঙ্গীদের একসঙ্গে হাজির করেন। কিছুক্ষণ পরে সেখানে একটি বড়ো গাড়ি এলে আমাদের সেই গাড়িতে জোর করে তুলে দেওয়া হয়। আমি মায়ের কাছে যাবো বলে 'মা' 'মা' করে কাঁদছিলাম, তখন এক শক্তসমর্থ মানুষ আমাকে লাঠি দিয়ে মারে। আমি অসহায় হয়ে গাড়িতে বসে পড়ি। আমার অন্য সঙ্গীদেরও অবস্থা খারাপ ছিল। সকলের চেহারাতে দুঃখীভাব ও পাঁশুটেবর্ণ দেখে একদিকে যেমন ভয় হচ্ছিল, অন্যদিকে গাড়ির তীব্র গতিতে আমাদের দেহে খুব আঘাত লাগছিল। দিন গেল, রাত এল, রাতও গেল আবার দিন এলো, কিন্তু গাড়ি চলতেই থাকল। গাড়ির চালক পথে আমাদের দুবার কিছু খেতে দিয়েছিল, কিন্তু তাতে আমাদের অর্ধেক পেটও ভরল না। তারপর আমাদের গাড়ি এক বড়ো শহরে এসে থামল। তখন গাড়ির কাছে এক লম্বা দাড়িওয়ালা লোক এলো, সে গাড়ির লোককে কিছু দিল আর গাড়িওয়ালা আমাদের সকলকে তার হাতে তুলে দিল। নতুন মালিক আমাদের লাঠি দিয়ে মারতে মারতে একটি বাড়ির কাছে এনে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নাজেহাল অবস্থা তার ওপর রোদ আর মালিকের লাঠির আঘাত, আমাদের তখন কষ্টে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে আমাদের একটি ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢোকানো হল। সেখানে এক ব্যক্তি কানে নল লাগিয়ে সমবেত সকলকে যেন এক এক করে দেখছিল। যখন আমাদের সময় এলো, আমাদের মালিক তাকে কিছু দিল আর সে আমাদের পরীক্ষা না করেই ভেতরে পাঠালো। আমি এসব বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমার এক বয়স্ক সঙ্গী জানাল যে ঐ লোকটি ডাক্তার, সে আমাদের পরীক্ষা করছিল, কারণ এখন আমরা মৃত্যুর সম্মুখীন। একথা

শুনেই আমি তো আধমরা হয়ে গেছি, ভয়ে খিদে-তেষ্টা চলে গেছে, আমাকে খাবার ও জল দিলেও আমি খেতে পারিনি। জল খাবার জন্য মুখ বাড়িয়েও ভয়ে জল খেতে পারিনি। তখনই পাশের ঘরের দরজা খোলে আর সেই ঘরের দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। চোখে অন্ধকার নেমে আসে। সেই ঘর থেকে আমার সঙ্গীদের কান্না ও চিৎকার ভেসে আসছিল, তা শুনে আমারও কান্না পেল। আমি চিৎকার করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু জানিনা আমার কী হল, মুখ থেকে কোনো আওয়াজই বেরোলো না। বাইরে পালাবার চেষ্টা করলাম আর তখনই এক ব্যক্তি আমার দুই পা ধরে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল, যেখানে এক ভয়ংকর রাক্ষসের মতো লোক ছুরি দিয়ে আমার সঙ্গীদের কাটছিল। হঠাৎ আমার মাথায় এক চিন্তা এলো যে, একি সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে দেবতা ও পীরের বংশধর বলে এবং অহিংসার বুলি আওড়ায় ? না, এই ব্যক্তি সে হতে পারে না। এমন ভয়ংকর হিংসা তো পশুও করে না, যারা পশুহত্যা করে নিজেদের পেট ভরে ! আমি যখন এইসব কথা ভাবছি তখনই একটি লোক আমার কান টেনে ভয়ংকর সেই লোকটির কাছে নিয়ে গেল। যন্ত্রণায় আমার ভয় এবার রাগে পরিণত হল। আমি পূর্ণ শক্তিতে পালিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। রাগে রক্ত ফুটতে লাগল, মুখ দিয়ে ফেনা উঠল, মল-মূত্র বেরিয়ে এলো, কিন্তু আমার অবস্থা দেখে কারো দয়া হল না। উল্টে আরও দুজন এসে আমাকে ধরল, একজন পা ধরে থাকল আর অন্যজন আমার গলায় ছুরি চালালো। আমার গলা দিয়ে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এলো, সর্বদেহ ব্যথায় ভরে গেল। এখন আমার আর কোনো উপায় ছিল না। তাই আমি চাইছিলাম যে আমায় এখনই মেরে দিক, আমি আর এই কষ্ট সইতে পারছি না। কিন্তু তা নয়, আমার কষ্ট পাওয়ার আরও বাকী ছিল, কারণ অর্ধেক গলা কাটায় আমার মরতে দেরী হচ্ছিল। এই কষ্টে আমার কাছে এক একটি মুহূর্তকে যেন এক এক বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। কখনও নিজের ভাগ্যকে দায়ী করে আবার কখনও ভগবানকে স্মরণ করে আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলাম।

আস্তে আস্তে চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, চেতনা লুপ্ত হল, নিঃশ্বাস বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হল আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে আর

যমদূত আমাকে আকাশপথে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একী ? আমার দেহ তো এখনও কসাইখানায় পড়ে আছে আর দুজন লোক আমার দেহের ছাল থেকে মাংস ও চর্বী আলাদা করছে। তারা ছাল ও চর্বি-মাংস পৃথক করে রাখছে। কিছুক্ষণ পরে অন্য একটি লোক এসে আমার মাংস কিনে হোটেলের রান্নাঘরে দিয়ে এলো। আর একজন ছুরি দিয়ে আমার মাংসের অসংখ্য টুকরো করে ফেলল। দেবতা স্বরূপ সেই ব্যক্তির বোধহয় এইসব অপরাধও কিছু কম ছিল, কারণ কাটার ওপর নুন-লঙ্কা ছেটানোও তাদের বংশের নিয়ম এবং শখ, তা যে তখনও বাকী, তা তিনি ছাড়বেন কেন ? তাই আমার মাংস কেটে তাতে নুন-লঙ্কা ও মশলা মেখে আগুনে রান্না করে তিনি পুরো হিংস্রতার পরিচয় দিলেন। এরপর কী হবে আমি তা দেখছিলাম, তখনই একটি লোক একটি প্লেটে আমার মাংস এনে একটি সাজানো ঘরে নবদম্পতির কাছে রাখল। যুবকটি খুব আনন্দের সঙ্গে আমাকে খেতে লাগল। কিন্তু তার বউয়ের বোধহয় মাংস খেতে ভালো লাগছিল না, সে শুধু স্বামীকে সঙ্গ দেবার জন্য একটু একটু করে খাচ্ছিল।

এখন আমি ধর্মরাজের দরবারে পৌঁছে জীবাত্মাদের লাইনে দাঁড়িয়েছি এবং চিত্রগুপ্তের কথায় সকলের যে হিসাব-নিকাশ হচ্ছে, তা আমাকে আকৃষ্ট করছে। আমার সময় এলে চিত্রগুপ্ত জানালেন যে গতজন্মে আমি এক পাঁঠার মাংস খেয়েছিলাম, যার জন্য আমাকে এই জন্মে পাঁঠার-জন্ম গ্রহণ করে অন্যের আহার হতে হয়েছে। তিনি আরও জানালেন যে, হোটেলে যে যুবকটি তোমার মাংস-ভক্ষণ করছে, পূর্বজন্মে সে তোমার প্রিয় সন্তান ছিল, যার পালনের জন্য তুমি সেই জন্মে সমস্ত জীবন ধরে খেটে মরেছো। এখন সে এই জন্মে তোমার মাংস খাচ্ছে, পরের জন্মে ওকে এর ফল ভোগ করতে হবে। একথা শুনে আমার অন্তর কেঁপে উঠল। আমি কী করে এই ব্যাপার সহ্য করব যে আমার সন্তানকেও আমার মতই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে ? তাই আমি ধর্মরাজের কাছে প্রার্থনা করলাম যে, এদের সকলকে তিনি ক্ষমা করে দিন, কারণ আমিও তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি কারোর কোনো প্রতিশোধ নিতে চাই না। ধর্মরাজ আমাকে কৃপা করলেন এবং বললেন, 'যেহেতু তুমি পাঁঠার জন্মে শুধু বেল পাতা

খেয়েছ এবং কারো কোনো ক্ষতি করোনি এবং এখন সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছ, তাই এখন তোমাকে মনুষ্য জন্ম দেওয়া হচ্ছে' আর তিনি আমার আত্মাকে পুনরায় মনুষ্য-জন্মের জন্য প্রেরণ করলেন।

অন্য জন্মে যাবার সময় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এবার আমি দয়া, সত্য এবং সদাচারণই করব আর কখনও কোনো জীবের মাংসভক্ষণ তো দূরের কথা, কোনো জীবকে সামান্য কষ্টও দেব না এবং কারো কোনো ক্ষতি করব না। আমি সর্বদা সর্বজীবকে রক্ষা করব, এই চিন্তা নিয়ে আমি আমার নতুন মায়ের গর্ভে প্রবেশ করলাম।

———o———
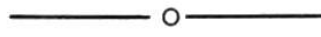
## (১৮) ফ্যাশন অথবা সৌন্দর্য-প্রসাধনের জন্য জীব-হত্যা করা কেন ?

মানুষ শুধুমাত্র স্বাদ ও স্বাস্থ্যলাভের জন্যই জীব-হত্যা করে না, তারা জেনে অথবা না জেনে ফ্যাসনের জন্য এমন সব প্রসাধনী-দ্রব্য ব্যবহার করে, যেগুলি প্রস্তুত করার জন্য জীবকে হত্যা করা হয় বা কষ্ট দেওয়া হয়।

যেমন যে ফারের টুপি (শিশু- মেষের অতিশয় কোমল চামড়ায় প্রস্তুত[১]) পরে সে হয়তো জানে না যে এটি তৈরি করার জন্য ভেড়ার গর্ভ থেকে অতিশয় কোমল বাচ্চাকে জোর করে বার করে তার চামড়া দিয়ে এটি তৈরী হয়। তেমনই এটাও হয়ত জানা নেই যে শ্যাম্পু বা After Shave Lotion প্রস্তুত করার জন্য সৌন্দর্য প্রসাধনী নির্মাণ করতে খরগোশের ওপর কত অত্যাচার করা হয়!

পুণার "Beauty without Cruelty" সংস্থা[২] অনেক অনুসন্ধানের পর প্রসাধন দ্রব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে যাতে শুধু বনজ পদার্থই ব্যবহৃত হয় এবং যেটি প্রস্তুত করতে কোনো পশু-পক্ষীকে হত্যা করা বা

[১]শাকাহার ক্রান্তি, জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

[২]Beauty without Cruelty, 4 Prince of Wales Drive, Wanowrie, Poona 411040

কষ্ট দেওয়া হয় না।

প্রসাধন তালিকায় আমাদের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকারের বস্তুই রয়েছে যেমন Cream, Lotion, Oil, Eye make up items, Hair preparations, Nail Polish & remover, Perfumes, Colognes, Toilet water, Powders, Shops & Shampoos, Tooth Powders & Tooth Pastes, Toilet preparations for men, Lipsticks, Perfumery Products, etc etc. প্রয়োজনে উপরোক্ত সংস্থায় লিখে পাঠালে প্রস্তুতকারকদের নাম-ঠিকানাসহ পূর্ণ বিবরণ পাওয়া সম্ভব।

---o---
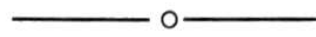
## ১৯. আমিষ আহারকারীদের বিতর্কের উত্তর

আমিষ খাদ্যের ঔচিত্য প্রমাণ করার জন্য আমিষাশী ব্যক্তিগণ যে সকল তর্ক প্রস্তুত করেন, তার উত্তর এইরূপ ঃ

**প্রশ্ন—প্রকৃতি জীবনের জন্য সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়, একটি জীব অন্য জীবকে শিকার করে, আহার করে বাঁচে, তাহলে মানুষ যদি পশুকে আহার করে, তাতে দোষ কী ?**

**উত্তর**—প্রকৃতি জীবনের জন্য সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়, কিন্তু তার অর্থ অন্যকে মারা ও খাওয়া নয়, তা নিজের এবং অন্যের জীবন রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা। এতে সন্দেহ নেই যে কিছু জঙ্গলী বা নিম্নশ্রেণীর পশু অপরের মাংস খেয়ে বাঁচে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর পশু গরু, ঘোড়া, হাতি, উট এরা ঘাস বা বনস্পতি আহার করে বাঁচে। বহু পশু ফল খেয়ে বাঁচে, যেমন মনুষ্যাকারবিশিষ্ট বাঁদর, হনুমান, গরিলা প্রভৃতি। বহু পশু নিজেদের জাতির দুর্বল ও রুগ্ন পশুর সাহায্য করে। মানুষের তুলনা শিকারী পশুদের পরিবর্তে শাকাহারী ঘোড়া, হাতি প্রভৃতিদের সঙ্গে কেন করা হবে না ?

জীব-বিজ্ঞানের আধারে মানুষের শারীরিক গঠন মাংসাহারী পশুদের থেকে একেবারে আলাদা, যা প্রমাণ করে যে প্রকৃতি তাকে মাংস ভক্ষণের জন্য সৃষ্টি করেনি। প্রকৃতি মানুষের জন্য অনেক বস্তু প্রদান করেছে এবং

তাকে সেই যোগ্যতা দিয়েছে, যাতে সে চাষ-বাস করে জীবন-যাপন করতে পারে। এরূপ যোগ্যতা ও সভ্যতার মালিক হয়েও মানুষ যদি শিকারী পশুকে নকল করে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করে, তাহলে তাকে মন্দই বলা হবে।

**প্রশ্ন—মানুষ যদি শাকাহারী জীব হয়, তাহলে তাদের মুখে কুকুর-দাঁত থাকে কেন ?**

**উত্তর**—মানুষের মুখের মধ্যে যেটিকে কুকুর-দাঁত বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেটি আসলে বাঁদরের মতো বাঁদর-দাঁত। এর সঙ্গে মাংসাহারের কোনো সম্পর্ক নেই।

**প্রশ্ন—পশুদের যদি মেরে খাওয়া না হয়, তবে পশুতে কী পৃথিবী ভরে যাবে না ?**

**উত্তর**—এটা এক অলীক চিন্তা। কারণ পশুর সংখ্যা অনাহার, অসুখ , মহামারী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপায়ের মাধ্যমে সঠিক সীমায় বদ্ধ থাকে। জঙ্গলী জানোয়ার প্রায়শঃ জঙ্গলেই থাকে এবং একে অন্যের খাদ্য হওয়ায় সেগুলির পরস্পর সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যেসব পশুর মাংস খাওয়া হয়, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলিকে আহার বানাবার জন্যই পালন করে। মানুষ যদি এরূপ কৃত্রিম উপায়ে পশুদের বৃদ্ধির চেষ্টা না করে, তবে সেগুলির সংখ্যা সীমার মধ্যেই থাকবে।

**প্রশ্ন—শুধু আমি আমিষ খাদ্য ত্যাগ করলেই কী জীব হত্যা বন্ধ হবে ?**

**উত্তর**— আপনি আমিষ খাদ্য ত্যাগ করলে জীবহত্যা সমাপ্ত হবে না, তবে কম অবশ্যই হবে, সেইসঙ্গে জীবহত্যা সমাপ্তির পথে প্রগতি হবে। একজন ব্যক্তিই তো প্রথমে একটি কাজ করে, পরে এক থেকে দুই ও দুই থেকে অনেক হয়। আপনার উদাহরণ থেকে আপনার সম্পর্কিত অনেকেই মাংসাহার ত্যাগ করতে উৎসাহিত হবেন, পরে তাঁদের থেকে আরও অনেকেই পরিত্যাগ করার আগ্রহ দেখাবেন। এইভাবে আপনি মাংসাহার ত্যাগ করলে বহু ব্যক্তিই মাংসাহার ত্যাগে অগ্রসর হবেন।

**প্রশ্ন—সাপ, বাঘ ইত্যাদিকে হত্যা করা যদি দোষের না হয়, তাহলে মাংসাহারে কী দোষ ?**

**উত্তর**—**'নিজে বাঁচো এবং অন্যকেও বাঁচতে দাও'**—এই সিদ্ধান্তের পালন

করাই উত্তম। কোনো পশু যদি আক্রমণ করে তাহলে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা হল আত্মরক্ষা, মানুষের সেই কাজকে উচিত বলা হয় কারণ তা আত্মরক্ষার জন্য, হত্যা করার জন্য নয়। কিন্তু নিজের শখ, স্বাদ ইত্যাদির জন্য পশু-হত্যা করা অপরাধ, সকল ধর্মেই তা নিষিদ্ধ। আইনের চোখেও কারোকে জেনেশুনে হত্যা করাকে অপরাধ বলা হয়। আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে যদি হত্যা করতেও হয়, তাহলে তাকে অপরাধ বলা হয় না।

**প্রশ্ন—মানুষ যখন চলাফেরা করে, তখন অনেক ছোট জীব মরে যায়, তাহলে অন্য জীবকে যদি মানুষের জন্য হত্যা করা হয়, তাকে কী পার্থক্য ?**

**উত্তর**—মানুষের চরিত্র তার চিন্তাধারা ও স্বেচ্ছাপূর্বক করা কাজের ওপর আধারিত। মানুষ যদি জেনে শুনে পায়ের তলায় নিজের স্বার্থে কোনো প্রাণীকে বধ করে— যে প্রাণী তার কোনো ক্ষতি করেনি, তাহলে সেটি হিংসা। কিন্তু যদি অসাবধানে বা কোনো অনিবার্য কারণে কিছু জীবাণু মারা যায়, তাহলে সেটি অপারগতা। কিন্তু শুধু আহার করার জন্য অকারণে বধ করা বা করানোকে হত্যাই বলা হবে।

**প্রশ্ন— বনস্পতি-বিজ্ঞান অনুসারে গাছ-পালাতেও জীবন আছে, তাহলে আমিষ খাদ্য ও নিরামিষ খাদ্যে পার্থক্য কী ?**

**উত্তর**—জগতে দুপ্রকারের জীব আছে, জড় এবং চেতন। মানুষ, পশু-পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদি চেতন জীব আর গাছপালা হল জড় পদার্থের অন্তর্গত। গাছের ফল পেকে আপনিই পড়ে যায়, গাছে শাখা বা পাতা কাটা হলে তা আবার বেড়ে ওঠে। বহু গাছের কলম লাগানো হয়, এক স্থান থেকে তুলে অন্য স্থানে লাগানো যায়। কিন্তু কোনো পশু-পক্ষীকে তার অঙ্গ কাটলে আবার নতুন অঙ্গ গজাবে, তা হয় না। পশু-পক্ষীদের মানুষ গাছপালার মতো উৎপন্ন করতে পারে না। জগতের সকল জীব পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশের সৃষ্ট। মানুষের ক্ষেত্রে এই পঞ্চতত্ত্ব প্রকট ও পূর্ণ। পাখিদের মধ্যে তিন তত্ত্ব—বায়ু, জল ও অগ্নিই মুখ্য। কীট-পতঙ্গে শুধু পৃথিবী ও অগ্নি—এই দুই তত্ত্বই মুখ্য। ফল-শাক-সব্জী-বনস্পতিতে জল-তত্ত্বই প্রধান অন্য চার তত্ত্ব মৃত-প্রায়। তাই শাক-সব্জী খেলে পশু-মাংসের তুলনায় ক্ষতি হয় অতিশয় নগণ্য। সাধু-মহাত্মারা নিজেরা গাছ থেকে ফল

পাড়েন না, আপনি পড়ে যাওয়া ফলই খান, যাতে একটুও পাপ না হয়। গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা পাপ নয়, গাছ কাটা পাপ।

আমিষাশী হয়ে হাজার মন পাপের বোঝা বওয়ার চেয়ে নিরামিষাশী হয়ে এক কিলো বোঝা বওয়া ভালো।

**প্রশ্ন—মাংস কি বেশি পুষ্টিদায়ক খাদ্য নয় ?**

**উত্তর**— ডাল, সোয়াবীন, মেওয়া ইত্যাদিতে মাংস বা ডিমের থেকে বেশি প্রোটিন থাকে। আমাদের দেহে যতো প্রোটিন প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি প্রোটিন আমরা সহজেই শাকাহার খাদ্য থেকে পেতে পারি। তাছাড়া শাকাহার খাদ্যে শরীরের বিকাশ এবং রোগমুক্ত রাখতে ভিটামিন, খনিজ ইত্যাদিও পাওয়া যায়, যা মাংসে পাওয়া যায় না।

মাংস খেলে শরীরে বলের পরিবর্তে একপ্রকার উত্তেজনা উৎপন্ন হয়। মাংস খেলে শরীরে নাইট্রোজেন বেশি হয় যাতে ইউরিক এ্যাসিড, লিউকোমিন, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি পদার্থ উৎপন্ন হয়। এইসব বৃথা পদার্থ দেহ থেকে বার করার জন্য শরীরকে বহু শক্তি ব্যয় করতে হয়। যাকে শক্তি উৎপন্নকারী বলে মনে করা হয়, বাস্তবে এই প্রক্রিয়ায় দেহের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়।

**প্রশ্ন— ইউরোপের মাংসাহারী জাতি কি অধিক সুসভ্য, বিদ্বান এবং শক্তিশালী নয় ?**

**উত্তর**—তাদের সভ্যতা, শক্তি, বিজ্ঞতা মাংসাহারের জন্য নয়। তাদের অন্যান্য গুণ যেমন অনুশাসন, একাগ্রতা, পরস্পরের সহযোগিতা, প্রকৃতির শক্তি থেকে শক্তি সংগ্রহ করা এইসব গুণই তার কারণ। অনেক জঙ্গলী জাতিও তো মাংসাহারী, কিন্তু উপরোক্ত গুণ না থাকায় তারা পিছিয়েই আছে। এখন ইউরোপেও মাংসাহারের বিপক্ষে এবং শাকাহারের পক্ষে জোর আন্দোলন হচ্ছে। সুতরাং ইউরোপের জাতিসমূহের শক্তির কারণ মাংসাহার, একথা সঠিক নয়।

**প্রশ্ন—কিছু ব্যক্তি মাংস আহার করাকে পুণ্য বলে থাকেন, আবার কিছু ব্যক্তি বলেন পাপ ; প্রকৃতপক্ষে এটা কী ? এটি যদি পাপ হয় তাহলে যেসব মানুষের জন্ম মাংসাহারী বংশে ও পরিবেশে সৃষ্ট হয়েছে এবং শিশুকাল থেকেই যার মাংস আহার করা অভ্যাস, সে মাংস খাওয়াকে কীভাবে পাপ বলে মনে করতে পারে ?**

**উত্তর**—মাংস আহার করার সব থেকে বড়ো দোষ হল, হিংসা না করে মাংস পাওয়া যায় না এবং কোনো প্রাণীকেই কোনোভাবে কিছুমাত্র কষ্ট দেওয়াই হল পাপ। তাকে সমূলে হত্যা করা তো মহাপাপ। এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই মাংসাহারকে পুণ্য বলে মানা যায় না ; কারণ এটি বাস্তবিকই পাপ। যে সব ব্যক্তি মাংসাহারকে পুণ্য মনে করেন অথবা যাঁরা পাপ মনে করেন না, তাঁরাও গভীরভাবে চিন্তা করলে সম্ভবতঃ তাঁদের বুদ্ধিতেও মাংসাহারকে পাপ বলেই মনে হবে। কারণ যার মাংস খাওয়া হয়, সেই জীব প্রত্যক্ষভাবেই মহাকষ্ট পায় এবং মৃত্যুমুখে পড়ে। কোনোভাবে কাউকে দুঃখ দেওয়াই পাপ। নিজের শরীরকে উদাহরণ করে তারপর চিন্তা করা উচিত। বিবেচক মানুষের কখনও এমন কর্তব্য হতে পারে না যে, যে কাজ তার কাছে মহাদুঃখের মনে হয় তা অপরের জন্য করা। এতো প্রত্যক্ষভাবেই দেখা যায় যে, আঘাত লাগলে বা মারলে আমাদের যেমন কষ্ট হয়, পশু-পক্ষীদেরও তেমনই কষ্ট হয়। আঘাত করার সময় তাদের কান্না, চিৎকার এবং অব্যাহতি পাবার চেষ্টাতেই তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। তাহলে নিজের শরীর ধারণের জন্য বা স্বাদের জন্য অন্য জীবকে মৃত্যুমুখে ফেলাকে কোনোভাবে মনুষ্যত্ব বলা যায় না।

পশু-পক্ষী হত্যা করে তাদের মাংস খাওয়ায় তাদের বা নিজেদের —কারও পক্ষেই হিতকারক নয় ; পশু-পক্ষী তো ভয়ানক কষ্ট পায় ও মারা যায় ; উপরন্তু মাংসাহারীরও অত্যন্ত ক্ষতি হয়। মাংসাহার করলে মানুষের স্বভাব ক্রূর এবং তামসিক হয়ে যায়, তার হৃদয় থেকে দয়া অন্তর্হিত হয়। মানুষ যার মাংস খায়, সেই জীবের অসুখ ও ক্রূর স্বভাবের অণু তার দেহে প্রবেশ করলে নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হয়, পাপ তো হয়ই। মানুষের মুখাকৃতি এবং দাঁতের গঠন দেখলে একথা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে, মাংস মানুষের আহার নয়। যেটি যার আহার নয়, তা তার জন্য অখাদ্য এবং স্বাস্থ্যনাশক। দুর্গন্ধের জন্যও মাংস অখাদ্য। আর এটি তেমন প্রয়োজনীয়ও নয় যে এটি না হলে জীবন-ধারণ হবে না ; তাছাড়া এতে মানুষের অধিকারও নেই। জীবকে সাহায্য করা, তাদের বৃদ্ধি করা এবং তাদের জীবন-ধারণে সহায়তা দেওয়ারই অধিকার মানুষের আছে, মারবার অধিকার কখনও নয়। কারণ ঈশ্বর মানুষ উৎপন্ন করেছেন সমস্ত চরাচর

প্রাণীদের রক্ষার জন্য, ভক্ষণের জন্য নয়। একথা তার বিদ্যা, বুদ্ধি, আকৃতি ও যোগ্যতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। একথাও চিন্তা করা উচিত যে, মাংসাহার করলে মানুষ ক্ষণিক সময়ের জন্যই সুখ পায় আর অল্প সময়ের জন্যই তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই প্রাণীটি চিরকালের মতো মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সব বিষয় চিন্তা করলে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাংসাহারকে পুণ্য বলতে পারেন না এবং এও বলতে পারেন না যে এ পাপ নয়। এতো এক প্রকারের জোর-জুলুম। পশু-পক্ষীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বলবান পশু-পক্ষী নির্বল জীবেদের হত্যা করে। বুদ্ধিমান হওয়ায় মানুষ সব থেকে বলবান ; সুতরাং সে যদি ছল-বল-কৌশলদ্বারা নিরীহ, নির্বল, মূক পশুদের হত্যা করে, তাহলে সেটি তার মানবদেহে পশুত্বভাব। পশুদের কর্তব্য-অকর্তব্য বুদ্ধি থাকে না, তাই আমরা বলতে পারি যে তাদের এতে পাপ হয় না, কিন্তু মানুষের তো বুদ্ধি আছে। অতএব সে যদি অন্য জীবকে মেরে বা হত্যা করিয়ে মাংসাহার করে তাহলে সে তো পশুরও অধম। শুধু পশু-পক্ষীই নয়, গভীর ভাবে চিন্তা করলে জানা যায় যে, সজীব সবুজ গাছ এবং লতা কাটলেও কোনো অংশে তা-ও হিংসা। কিন্তু সংসারের কোনো কাজই নির্দোষ হয় না আর মানুষের জীবিকা-নির্বাহের জন্য তা করতে হয়। তাদের আকৃতি থেকে জানা যায় যে, ফল-মূল ইত্যার্দিই তাদের খাদ্য। তা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব এই ফল-মূলের ব্যবহারও প্রয়োজনানুসারে কম করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফল-মূল-বৃক্ষ নষ্ট করা কখনও উচিত নয়। বৃক্ষের উন্নতির জন্য বা তার বৃদ্ধির জন্যও বৃক্ষ ছেদন করতে হয়। কলম করলে বৃক্ষ বেড়ে ওঠে, ফল থেকে বীজ হয় এবং সেই বীজ থেকে আবার বৃক্ষ হয় ; কিন্তু মাংস আহারে শুধু বিনাশই হয়ে থাকে। সুতরাং মাংস আহার করা সর্বতোভাবে পাপ ও পরিত্যাজ্য।

জগতে যতো জড় পদার্থ আছে, সে-সবই কোনো না কোনোভাবে চেতন বস্তুর জন্যই রয়েছে। কিন্তু তাদেরও অযথা ক্ষয় করা পাপ। সুতরাং চেতন প্রাণীদের হত্যা করা বা করানো যে পাপ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে ব্যক্তির জন্ম ও বেড়ে-ওঠা আমিষাশী কুল ও পরিবেশে হয়েছে এবং শিশুকাল থেকেই যার তেমনই স্বভাব, তার জন্যও আমিষ ভোজন সর্বতোভাবে ত্যাজ্য। মানুষের বিবেক তার সব থেকে বড়ো সম্পদ। এর

দ্বারা সে বুঝতে পারে যে অন্যকে আঘাত করলে বা মারলে আমার যেমন দুঃখ কষ্ট হয়, তেমনই অন্য প্রাণীরও হয়। অন্য প্রাণীদের মরার এবং মারার সময় তাদের যে ভয়ংকর কষ্ট হয়, আমিষাশী ব্যক্তি তা দেখে এবং শোনে। সেই অবস্থায় মানুষ হওয়ায় তার পক্ষে আমিষ খাওয়া পাপ। তাই আমিষ খাদ্যকে পাপ মনে করে মানুষের সত্বর তা ত্যাগ করা উচিত।

**প্রশ্ন—ডাক্তার যদি আমিষ খাদ্য খেতে বলেন, তখন কী করা উচিত ?**

**উত্তর**— প্রকৃতি এতো নিরামিষ পদার্থ উৎপন্ন করেছে যে আমিষের পরিবর্তে সেসব গ্রহণ করলে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। আমিষ পদার্থে শুধু প্রোটিন এবং ফ্যাটই বেশি থাকে, যা ডাল, দুধ, মাখন ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়। সুতরাং আমিষ খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় নয়। এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী এবং জর্জ বার্ণার্ড শ'য়ের উদাহারণ দ্রষ্টব্য, যাঁরা 'আমিষ না খেলে বাঁচবে না', —ডাক্তারের এই সিদ্ধান্ত শুনেও মাংসাহার না করে বেঁচেছিলেন। সুতরাং ডাক্তারের আমিষ খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ মানা উচিত নয়, তার জায়গায় নিরামিষ খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মানুষ যেসব পশু-পক্ষীদের মাংস খায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের খাদ্য হল ফল-মূল-পাতা, শস্য-দানা ইত্যাদি। মাংসাহারীর মাংস কিন্তু প্রায়ই মানুষ খায় না।

———○———

## (২০) আমিষ থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায়

এই পুস্তকে বর্ণিত আমিষ এবং নিরামিষ খাদ্যের দোষ-গুণ জেনে এবং আমিষ খাদ্য থেকে হওয়া অসুখ এবং ক্ষতি জানার পর যেসব মানুষ আমিষ বর্জন করে নিরামিষাশী হতে চান কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতির জন্য অথবা স্বাদের জন্য এটি ত্যাগ করতে পারেন না, আমাদের মতে তাঁদের নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত।

১) আমিষ খাদ্যের দ্বারা হওয়া ক্ষতিগুলি বারংবার পড়ে আমিষ ত্যাগ করার এক সাধারণ চিন্তাকে দৃঢ় ইচ্ছায় পরিণত করে নেবেন। দৃঢ় ইচ্ছা না থাকলে সাফল্য আসে না, কথায় বলে **'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।'**

২) নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, আমিষ খাদ্য ত্যাগ করা সমাজ শোধরাবার ও পরিবার কল্যাণের একটি উত্তম কাজ। এটি আপনাকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে যায়, কারণ সেই ব্যক্তিই আধুনিক, যিনি নতুন পথ জেনে সবার আগে তাতে অগ্রসর হন। নিরামিষাশী হওয়া গর্বের বিষয় বলে ভাববেন।

৩) নিজ মনকে ভালোভাবে বোঝাবেন যে আমিষ খাওয়া ছেড়ে দিলে শরীর দুর্বল হয় না, বরং ক্যান্সার ইত্যাদি অসুখ থেকে বাঁচা যায় ও শরীর বেশি পুষ্ট হয়।

৪) প্রারম্ভে কিছুদিন নিজ স্বাদ অনুযায়ী নিরামিষ পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত কাবাব ইত্যাদি (আমিষের মতো দেখতে) খাবার নেবেন। পরে ক্রমশঃ সাধারণ নিরামিষে চলে আসবেন।

৫) ডাইনিং টেবলে বা রান্নাঘরে আমিষের ক্ষতি দর্শানো কোনো বাক্য যেমন **'আমিষ আহার রোগাদির ভাণ্ডার'** ইত্যাদি লিখে রাখবেন, যাতে সেটি পড়ে পরিবারের সব সদস্যই আমিষ খাদ্য ত্যাগের কথা ভাবে।

৬) আমিষ খাদ্য সংগ্রহে পশুদের ওপর হওয়া অত্যাচার এবং তাদের কষ্টের কথা চিন্তা করবেন আর ভাববেন এরা আমার পূর্বজন্মের কেউ নয় তো ?

৭) উপরোক্ত সকল প্রকারের চেষ্টা সত্ত্বেও যদি আমিষ খাদ্য ত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে সাত সপ্তাহের জন্য একটি কার্যক্রম তৈরী করুন। প্রথম সপ্তাহে একদিন আমিষ খাবেন না, দ্বিতীয় সপ্তাহে দুদিন। এইভাবে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে বাড়িয়ে সপ্তম সপ্তাহে আমিষ খাদ্য একেবারে ত্যাগ করবেন।

আমিষ খাদ্য ত্যাগ করতে শুধু মনের দৃঢ়তাই প্রয়োজন। এটি ত্যাগ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। আমিষাশী বহু ব্যক্তিই এটি একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং আপনিও পারেন আমিষ খাদ্য ত্যাগ করতে। মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে আজই এই সর্বনাশকারী আহার থেকে নিজেকে মুক্ত করুন।

**মন হারলে হার, মন জিতলে জয়।**
**মাংস খাব না আমি, তাতে যে হয় আয়ু ক্ষয়॥**

———o———